لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

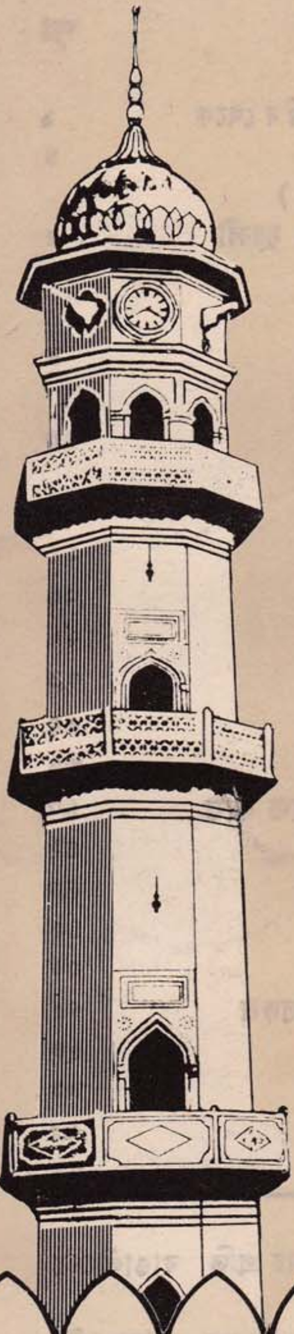

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

THE AHMADI

Fortnightly

নব পর্যায়ে ৫৫তম বর্ষ ।। ১৪ ও ১৫শ সংখ্যা

৩রা রমযান, ১৪১৪ হিঃ ।। ৩রা ফাল্গুন ১৪০০ বঙ্গাব্দ ।। ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ইং

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ৭২.০০ টাকা ।। ভারত ২ পাউণ্ড ।। অন্যান্য দেশ ১৫ পাউণ্ড ।।

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহমদী ১৪ ও ১৫শ সংখ্যা (৫৫তম বর্ষ) পৃঃ

তরজমাতুল কুরআন (তফসীরসহ)
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মজীদ থেকে ১
হাদীস শরীফ ঃ ৪
অমৃত বাণী ঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)
অনুবাদ ঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরব্বী ৫
জুমুআর খুতবা
হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)
জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান ৮
পবিত্র রমযান ও আমাদের করণীয় ঃ
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী, ন্যাশনাল আমীর ১৬
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মতামত ঃ
অধিকার ও যৌক্তিকতা ২০
লাপাত্তা ভগবান ও চিনিহীন চিনিওটি ২৩
ধর্ম রক্ষার নামে সন্ত্রাসী উস্কানি ২৬
নতুন ইস্যু নতুন ফাঁদ ২৮
জামাতে ইসলামীর নোতুন চক্রান্ত ৩১
দেশটাকে কি ওরা পাকিস্তান ভাবছে ৩৪
অধিকারের সীমানা ৩৭
দেশ ও জাতি গঠনে সিনেমা-টিভিকে কাজে লাগাতে হবে ৪০
একটি চিঠি ৪২
আপনার চিঠি পেলাম ৪৩
ন্যাশনাল আমীর সাহেবের উদ্বোধনী ভাষণ ঃ ৪৫
ছোটদের পাতা ৫৩
যাকাত সম্পর্কে বন্ধুদের খেদমতে একটি আবেদন ৫৫
সংবাদ ৫৬
আসহাবে কাহাফের পাতা—আররকীম ৬৩
ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ ঃ ৬৫
সম্পাদকীয় ঃ ৭৭

(৭৬ পাতার পর)

বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে সত্য সত্যই পৃথক হয়ে গেল। বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালীদের কতখানি ভালবাসা তা বাঙালীরা রক্ত দিয়ে প্রমাণ করে দিল।

উল্লেখ্য যে, আহমদী জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার কাছে একটি ঐশী বাণী হল,—"বাঙালী-দের মনতুষ্টি করা হবে" (তাজ্‌করা)। এই প্রতিশ্রুতিও ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে, বাংলা ভাষা রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা পেয়ে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে বার বার পূর্ণ হয়েছে।

(নির্বাহী সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী)।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৫তম বর্ষঃ ১৪ ও ১৫শ সংখ্যা

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ঃ ১৫ই তবলীগ ১৩৭৩ হিঃ শামসী ঃ ৩রা ফাল্গুন, ১৪০০ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আল্ বাকারা-২

১৮৪। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমাদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হইল, যেরূপে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের (২০৬) উপর ইহা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করিতে পার।

১৮৫। (ফরয রোযা) নির্দিষ্ট দিনগুলিতে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় অথবা সফরে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে; এবং যাহাদের পক্ষে ইহা (রোযা রাখা) ক্ষমতাতীত, (২০৭) তাহাদের উপর ফিদিয়া—

২০৬। ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসাবে রোযা (উপবাস-ব্রত) পালন কোনও না কোন আকারে সকল ধর্মেই পাওয়া যায়। "অধিকাংশ ধর্মগুলিতে এবং নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর কৃষ্টির মধ্যে, উপবাসব্রত একটি সাধারণভাবে নির্দেশিত ব্যাপার। আর যেখানে এই ধরনের নির্দেশ নাই, সেখানেও প্রাকৃতিক প্রয়োজনের তাকিদে অনেকেই উপবাস করিয়া থাকেন" (এনসাই-বৃট)। সাধুপুরুষ ও দিব্যজ্ঞানীগণের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায় যে, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও মনের পবিত্রতা সাধনের জন্য শারীরিক সম্পর্কসমূহ কিছুটা ছিন্ন করা এবং সাংসারিক বন্ধন হইতে কতকটা মুক্তিলাভ একান্তই প্রয়োজন। তবে, ইসলাম এই উপবাসব্রতের মধ্যে নবরূপ, নবঅর্থ ও নবতম আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আরোপ করিয়াছে। ইসলাম রোযাকে (উপবাস পালন) পূর্ণমাত্রার আত্মোৎসর্গ স্বরূপ মনে করিয়া থাকে। ইহা আত্মবলিদানের প্রতীক। যিনি রোযা পালন করেন, তিনি যে কেবল শরীর রক্ষাকারী খাদ্য-পানীয় হইতেই বিরত থাকেন তেমন নহে, বরং সন্তানদি জন্মদান তথা বংশবৃদ্ধির ক্রিয়াকলাপ হইতেও দূরে থাকেন। অতএব, যিনি রোযা রাখেন, তিনি তাহার প্রস্তুতির কথা জানাইয়া দেন যে, প্রয়োজন বোধে, তাহার প্রভু ও সৃষ্টিকর্তার খাতিরে তিনি তাহার সবকিছু, এমনকি তাহার জীবন পর্যন্ত কুরবানী করিয়া দিতে সামান্যও কুণ্ঠিত নহেন।

২০৭। 'ইয়ুতিকুনাহু'র অর্থ করা হইয়াছে, যাহাদের পক্ষে ইহা ক্ষমতাতীত বা যাহারা অতিকষ্টে ইহা (রোযা) করিতে পারে। অন্য পাঠ 'ইয়ূতাঈকুনাহু' এই অর্থকে সমর্থন করে

এক মিসকীনকে আহার্য দান করা। অতএব, যে-কেহ স্বেচ্ছায় পুণ্যকর্ম করিবে, উহা অবশ্য তাহার জন্য উত্তম হইবে। বস্তুতঃ তোমরা যদি জ্ঞান রাখ তাহা হইলে তোমাদের জন্য রোযা রাখাই কল্যাণকর।

১৮৬। রমযান (২০৭-ক) সেই মাস যাহাতে নাযেল (২০৮) করা হইয়াছে কুরআন (২০৭-খ) যাহা মানবজাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকানের (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদিস্বরূপ। সুতরাং তোমাদের

(জরীর)। এই আয়াতে তিন শ্রেণীর বিশ্বাসীকে রোযার ব্যাপারে কিছুটা রেহাই বা সুবিধা দেওয়া হইয়াছে— অসুস্থ, ভ্রমণরত এবং অতি দুর্বলদিগকে। 'ইয়ুতিকুনাহু'র অর্থ এখানে "যাহারা রোযা রাখিতে অসমর্থ" হইতে পারে (লিসান ও মুফরাদাত)। সমস্ত বাক্যটির অর্থ এইরূপও করা হইয়াছে, "রোযা রাখা ছাড়াও, অতিরিক্ত পুণ্য অর্জনের জন্য সামর্থ্যবান ও অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ" গরীবদিগকে খাওয়াইতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে 'ইয়ুতিকুনাহু'র সর্বনামটি একজন গরীবকে "খাওয়ানোর" পরিবর্তে ব্যবহৃত হইবে।

২০৭-ক। 'রমযান' চান্দ্রমাসগুলির মধ্যে নবম মাস। শব্দটি 'রামাযা' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'রামাযাস্ সায়মু' অর্থ রোযা করার কারণে রোযাদারের ভিতরটা তৃষ্ণায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে (লেইন)। মাসটির নামকরণ এই কারণে হইয়াছে (১) রোযার কারণেএই মাসটিতে মানুষের তৃষ্ণা ও জ্বালা বৃদ্ধি পায়, (২) এই মাসের ইবাদত-বন্দেগী মানুষের পাপকে জ্বালাইয়া-পুড়াইয়া নিঃশেষ করে (আসাকির ও মারদাওয়াই), (৩) এই মাসে মানুষের তপস্যা ও সাধনা তাহার মনে স্রষ্টার প্রতি ভালবাসার উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং মানবের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করে। 'রমযান' নামটি ইসলামের অবদান। এই মাসটির পূর্বনাম ছিল নাতিক (কাদীর)।

২০৭-খ। 'আল্-কুরআন' শব্দটি 'কারাআ' হইতে উৎপন্ন। 'কারাআ' অর্থ সে পাঠ করিয়াছিল সে বাণী পৌঁছাইয়াছিল, সে সংগ্রহ করিয়াছিল। 'কুরআন' অর্থ (১) পঠনের উপযোগী পুস্তক, যাহা বার বার পাঠ করা যায়; 'কুরআন বিশ্বের সর্বাধিক পঠনীয় পুস্তক' (এন্সাইক্লো-বৃট,), (২) একটি পুস্তক কিংবা বাণী যাহা পৃথিবীর সর্বত্র নিয়া যাওয়া ও পৌঁছানো প্রয়োজন, কুরআনই একমাত্র পুস্তক যাহার বাণী সারা বিশ্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে অবারিত। কেননা, যেখানে অন্যান্য অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থাদি স্থান, কাল ও পাত্রে সীমাবদ্ধ, সেখানে কুরআনই একমাত্র অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থ যাহা সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল সময়ের জন্য আসিয়াছে (৩৪:২৯) (৩) এমন গ্রন্থ যাহা সকল সত্যকে ধারণ করে, কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যাহা যাবতীয় জ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। ইহাতে অন্যান্য অবতীর্ণ গ্রন্থাবলীর শাশ্বত সত্যগুলি তো স্থান পাইয়াছেই, উপরন্তু সর্বাবস্থায় সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক নতুন নতুন শিক্ষা ও সত্য ইহাতে সংযোজিত হইয়া, ইহা সর্বকালের জন্য পূর্ণতম গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে (৯৮:৪, ১৮:৫০)।

(টিকা ২০৮ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মধ্যে যে কেহ এই মাসকে পায় সে যেন ইহাতে রোযা রাখে, কিন্তু যে-কেহ রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাহা হইলে অন্য দিনে (২০৯) গণনা পূর্ণ করিতে হইবে ; আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চাহেন এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চাহেন না, এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহর মহিমা কীর্তন কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দিয়াছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

১৮৭। এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বল) 'আমি নিকটে (২১০) আছি আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তাহারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান (২১১) আনে যাহাতে তাহারা সঠিকপথ প্রাপ্ত হয়'।

২০৮। রমযান মাসের ২৪ তারিখে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) প্রথম আল্লাহ্‌র বাণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (জরীর)। এই রমযান মাসেই, জিবরাঈল প্রতি বৎসর পূর্বে নাযেলকৃত সমস্ত বাণী রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট পুনরাবৃত্তি করিতেন। এই ব্যবস্থা মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাঁহার জীবনের শেষ বৎসরে রমযান মাসে প্রধান ফিরিশ্‌তা জিব্‌রাঈল পূর্ণ কুরআনকে মহানবী (সাঃ)-এর কাছে দুইবার পাঠ করিয়া শুনান (বুখারী)। এই হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র কুরআনই রমযান মাসে অবতীর্ণ হইয়াছে।

২০৯। এই বাক্যটি অপ্রয়োজনীয় উক্তি নয়। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতে মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতির ক্ষেত্র গঠনের জন্য এই বাক্যটি ব্যবহৃত হইয়াছিল, যাহাতে রোযা রাখার নির্দেশ তাহারা সহজে গ্রহণ করিতে পারে। এই আয়াতে ঐ নির্দেশের বাস্তবায়নকে উপলক্ষ্য করিয়া এই বাক্যটি ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে বাক্যটি নির্দেশেরই অঙ্গ-বিশেষ। 'অসুখ', 'ভ্রমণ' শব্দগুলিকে সংজ্ঞায়িত না করিয়া, কুরআন মানুষের সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শব্দগুলির অর্থ করার ভার ছাড়িয়া দিয়া বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দেখাইয়াছে।

২১০। যখন মানুষ রমযান মাসের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ও এই মাসে রোযা রাখার পুণ্য ও আশীর্বাদরাশির সম্বন্ধে অবগত হয়, তখন তাহারা স্বভাবতই ইহা হইতে খুব বেশী আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের আশা পোষণ করিয়া থাকে। মুমেনের এই আশা-আকাঙ্খার প্রত্যুত্তরে, এই আয়াতটি মুমেনের আত্মাকে নিশ্চয়তা দান করিতেছে।

২১১। "আমার উপর ঈমান আনে" এই বাক্যটির অর্থ এই স্থলে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে ঈমান আনা বা বিশ্বাস করা অর্থে নহে। কারণ পূর্ববর্তী বাক্যেই বলা হইয়াছে "তাহারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়"। অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিলে, সাড়া দেওয়ার কথাই আসিত না। অতএব, "আমার উপর ঈমান আনে" অর্থ এই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার প্রার্থনা শুনেন এবং মঞ্জুর করেন।

হাদিস শরীফ

ইসলামের ভিত্তি

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) বলিয়াছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত যথা ঃ এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ এক-অদ্বিতীয় তিনি ভিন্ন কোন উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁহার বান্দা ও রসূল, নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ পালন করা এবং রমযানের রোযা রাখা।

(বুখারী কিতাবুল ঈমান)

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বর্ণনা করেন, "আমরা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। তখন উজ্জ্বল ধব্‌ ধবে সাদা কাপড় পরিহিত এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইলেন যাহার চুল ঘন কৃষ্ণ বর্ণের ছিল। তাহার উপর সফরের কোন প্রভাব দেখা যাচ্ছিল না এবং তিনি আমাদের কাহারো নিকট পরিচিতও ছিলেন না। তিনি আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ)-এর এত নিকটে গিয়া বসিলেন এমন কি নিজের হাঁটু তাঁহার (সাঃ) হাঁটুর সহিত লাগাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি (আগন্তুক) বলিলেন, হে মুহাম্মদ (সাঃ)! "ঈমান কি?" তিনি (রসূল-সাঃ) বলিলেন, (ঈমান হইল এই যে,) আল্লাহ ও তাঁহার ফিরিশ্‌তাগণ, তাঁহার কিতাবসমূহ তাঁহার রসূলগণ, আখেরাত দিবস এবং যাহা ভাল মন্দের নিয়তির সহিত সম্পর্কিত ঐ সবের উপর ঈমান আনয়ন করা।"

(তিরমিযী, কিতাবুল ঈমান)

রোযা

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ বলেন, "রোযা ব্যতীত মানুষের সকল কাজ তাহার নিজের জন্য। ইহা (রোযা) একমাত্র আমার জন্য। এবং আমি নিজেই ইহার পুরস্কার প্রদান করিব এবং রোযা ঢাল (স্বরূপ)। এভাবে যখন তোমাদের মধ্যে কেহ রোযার দিন পায় তাহা হইলে সে যেন কোন অশ্লীল কথা না বলে এবং চেঁচা-মেচি না করে। যদি কোন ব্যক্তি তাহাকে গালি দেয় কিংবা তাহার সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় তাহা হইলে সে যেন বলে—আমি রোযাদার। মুহাম্মদের প্রাণ যাঁহার হাতে রহিয়াছে তাঁহার কসম (অভুক্ত থাকার কারণে) রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকটে কস্তুরীর সুগন্ধির চাইতেও পবিত্র-প্রিয়। যে-ব্যক্তি রোযা রাখে তাহার জন্য দুইটি আনন্দ যাহার দ্বারা সে উৎফুল্ল হয় যখন সে ইফতারী করে তখন খুশী হয় এবং যখন

(অবশিষ্টাংশ ৭ এর পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্দী (আঃ) এর

অমৃতবাণী

অনুবাদঃ মাওলানা আহমদ সাদেক মাহ্মুদ
সদর মুরব্বী

রোযা রাখার পুরস্কার অতি মহান, তাতে কোন সন্দেহ নাই।
রোযা হৃদয়ের উজ্জ্বলতা প্রদান করে ও কাশ্‌ফের দ্বার উন্মুক্ত করে।

"আরবী ভাষায় সূর্যের তাপকে 'রময' বলা হয়। যেহেতু রমযান মাসে রোযাদার ব্যক্তি পানাহার ও যাবতীয় দৈহিক ভোগবিলাস হইতে বিরত থাকে এবং আল্লাহ্‌র আদেশসমূহ পালন করিবার উদ্দেশ্যে নিজের প্রাণে এক প্রকার ব্যগ্রতার তাপ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। এই আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উভয় প্রকার তাপের সংমিশ্রণে রমযান হইয়াছে। আভিধানিকগণ বলিয়া থাকেন যে, রমযান গ্রীষ্মকালে আসিয়াছিল বলিয়াই উহাকে রমযান বলা হইয়াছে। আমার মতে এই ধারণা সঠিক নহে। কেননা আরবদেশের জন্য ইহাতে কোনও বিশেষত্ব থাকিতে পারে না। আধ্যাত্মিক তাপের অর্থ আধ্যাত্মিক অনুরাগ ও ধর্ম-কর্মে উদ্দীপনা। 'রমজ' এমন উত্তাপকেও বলা হয় যদ্বারা পাথর প্রভৃতি পদার্থও উত্তপ্ত হয়"।

(আল হাকাম, ২৪শে জুলাই, ১৯০১ইং)

"রমযান মাস অতি মঙ্গলজনক মাস। কেননা ইহা দোয়ার মাস।" (ঐ)

شهر رمضان الذى انزل فيه القران কুরআন শরীফের এই একটি পবিত্র বাক্য হইতে রমযান মাসের মাহাত্ম্য বুঝা যায়। এই আয়াতের অর্থ—রমযান পবিত্র মাস যাহার মধ্যে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে—অনুবাদক।) (ঐ)

সুফীগণ লিখিয়াছেন যে, এই মাসে আত্মাকে জ্যোতির্ময় করার উত্তম সুযোগ পাওয়া যায়। এই মাসে বহুল পরিমাণে কাশ্‌ফ (আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা) লাভ হইয়া থাকে।

নামায "তায্‌কিয়া-নফস" (আত্ম-শুদ্ধি) সাধিত করে এবং রোযায় তাজাল্লিয়ে-কলব সাধিত হয়। "তায্‌কিয়া-নফস" (আত্ম-শুদ্ধি)-এর অর্থ রিপু দমন শক্তির বৃদ্ধি লাভ। 'তাজাল্লিয়ে কল্‌ব' (আত্মার উজ্জ্বলতা) সাধিত হওয়ার অর্থ—"কাশফ" বা আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞানের দুয়ার উন্মুক্ত হইয়া খোদা-দর্শন লাভ করা।

... ...

(বদর, ১লা ডিসেম্বর, ১৯০২)

কুরআন করীম হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে,

فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

অর্থাৎ—অসুস্থ ও সফররত ব্যক্তির পক্ষে রোযা রাখা সঙ্গত নয়। ইহা খোদার আদেশ। আল্লাহ্‌তা'লা এরূপ নির্দেশ দেন নাই যে, রোযা যাহার ইচ্ছা রাখুক অথবা যাহার ইচ্ছা না রাখুক। যেহেতু অধিকাংশ লোক সাধারণতঃ সফরে রোযা রাখিয়া থাকে সেইহেতু যদি তাহারা প্রচলিত প্রথা বিবেচনা করিয়া রোযা রাখে, তাহা হইলে তাহারা রাখুক, কোন আপত্তি নাই কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও عدة من ايام اخر অর্থাৎ অন্য সময়ে সেই রোযা পুরা করিতে হইবে—আয়াতে উল্লিখিত আদেশ পালনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত"।

(আল্‌ হাকাম, ৩১শে জানুয়ারী, ১৮৯৬ইং)

"সফরে কষ্ট স্বীকার করিয়া যাহারা রোযা রাখিয়া থাকে তাহারা প্রকারান্তরে আল্লাহ্‌তা'লাকে বলপূর্বক সন্তুষ্ট করিতে চাহে। আল্লাহ্‌র হুকুম মান্য করিয়া আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি চাহে না। ইহা সম্পূর্ণ ভুল! আল্লাহ্‌র আদেশ এবং নিষেধ উভয়ই মান্য করার মধ্যে সত্যিকার ঈমান নিহিত"। (আল্‌ হাকাম, ৩১শে জানুয়ারী,১৮৯৯ইং)

"শরীয়তের ভিত্তি কাঠিন্যের উপর নহে বরং যাহাকে তোমরা সচরাচর সফর বলিয়া থাক তা-ই সফর। যেমন খোদাতা'লার নির্দেশিত ফরয (বাধ্যকর) বিষয়াবলীর উপর আমল করিতে হয়, তেমনিভাবে তাহার অনুমোদিত সুযোগ-সুবিধা পালন করাও অবশ্য কর্তব্য।

(আল্‌-হাকাম ঐ)

জুমুআ এবং ঈদের চাইতেও অধিকতর মোবারকপূর্ণ ও খুশীর দিন ঃ তওবার অর্থ মানুষ যেন পাপ ত্যাগ করিয়া পবিত্র হয় ঃ

সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী স্মরণ রাখিবেন যে, আল্লাহ্‌তা'লা ইসলামে কোন কোন এরূপ দিন নির্ধারিত করিয়াছেন যাহা নিতান্ত খুশীর দিন বলিয়া বিবেচিত হয় এবং সেই দিনগুলিতে আল্লাহ্‌তা'লা কল্পনাতীত বরকত ও কল্যাণ নিহিত রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি হইল জুমুআর দিন। এই দিনটি বড়ই মোবারক দিন। হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্‌তা'লা হযরত আদম (আঃ)-কে জুমুআর দিনেই সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং সেই দিনেই তাহার তওবা কবুল করিয়াছিলেন। সুতরাং জুমুআ ও ঈদের দিনগুলোকে বরকতের দিন হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে এবং ইহাদের মধ্যেও আল্লাহ্‌তা'লা আশ্চর্য ধরণের বরকত ও কল্যাণ রাখিয়াছেন। স্মরণ রাখিবে এই দিনগুলি সন্দেহাতীতভাবে যদিও নিজ নিজ স্থানে মোবারক এবং খুশীর দিন তথাপি উক্ত দিনগুলি অপেক্ষা অধিকতর মোবারক এবং আনন্দপূর্ণ আর একটি দিনও আছে। কিন্তু দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিতে হয় যে, মানুষ সেই দিনটির প্রতীক্ষাও

করে না, উহার সন্ধানও করে না। অন্যথা মানুষ যদি সেই দিনটির কল্যাণ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত হইত অথবা উহার পরওয়া করিত, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে সেই দিনটি তাহাদের জন্য নিতান্ত মোবারক এবং সৌভাগ্যের হিসাবে প্রতিপন্ন হইত এবং মানুষ উহার স্বতই সমাদর ও যত্ন করিত।

সেইটি কোন্ দিন যাহা জুমুআ এবং ঈদের চাইতেও উত্তম এবং মোবারক দিন। আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি যে, উহা হইল মানুষের তওবার দিন যাহা সব চাইতে উত্তম এবং প্রত্যেক ঈদ হইতে শ্রেষ্ঠ। যদি বল কেন? তবে শুন, এই জন্য যে, মানুষের যে আমলনামা (কর্ম-লিপি) তাহাকে ধীরে ধীরে জাহান্নামের নিকটে লইয়া যায় এবং ভিতরে ভিতরে সংগোপনে ইলাহী-গযবের নীচে তাহাকে উপনীত করে, সেই দিনটি তাহার ভয়াবহ আমলনামাকে ধৌত করিয়া দেয়, মোচন করিয়া দেয় এবং সেই দিন তাহার পাপ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের জন্য ইহার চাইতে আর কোন দিন খুশী এবং ঈদের দিন বলিয়া সাব্যস্ত হইতে পারে কি যাহা তাহাদেরকে অসহনীয় জাহান্নাম এবং সীমাহীন ইলাহী-গযব হইতে পরিত্রাণ দান করে?" (ভাষণ ২৮শে আগষ্ট, ১৯০৪ইং)

(৩০-৫-৮৯ তারিখের পাক্ষিক থেকে পুনঃ প্রকাশিত)

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর)

সে তাহার প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করে তখন সে নিজের রোযার দরুন আনন্দিত হয়। (বুখারী, কিতাবুস্ সাওম)।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসূল করীম (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কার্যকলাপকে ত্যাগ করে না তাহার পানাহার ত্যাগ করাতে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নাই।" (বুখারী, কিতাবুস্ সাওম)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) রমযানের শেষ দশ দিন (মসজিদে) ই'তেকাফে বসিতেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এইভাবেই করিতেন। তাঁহার (সাঃ) পর তাঁহার (সাঃ) সহধর্মিণীগণও অনুরূপভাবে ই'তেকাফ করিতেন"।

(বুখারী, কিতাবুল ই'তেকাফ)

(৩-৩-৮৯ তারিখের পাক্ষিক থেকে পুনঃ প্রকাশিত)

বিঃ দ্রঃ—অনিবার্য কারণবশতঃ ১৪-১৫শ সংখ্যা একত্রে প্রকাশ করতে হচ্ছে বলে আমরা দুঃখিত।

(ব্যবস্থাপনা—পাক্ষিক আহমদী)

জুমু'আর খুতবা

[সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ) কর্তৃক ৯-৭-৯৩ তারিখে মসজিদ ফযল লণ্ডনে প্রদত্ত জুমুআর খুতবার বঙ্গানুবাদ]

—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

তৌহীদ সারা দুনিয়ার মানুষের জন্যে স্বাধীনতার বার্তাবাহী।

ইসলাম তৌহীদের ওপরে যতখানি গুরুত্ব প্রদান করেছে অন্যান্য ধর্ম-গুলোতে এর এক দশমাংশও পরিদৃষ্ট হয় না।

পাশ্চাত্য জগতের অধিবাসীদের নিকট সবচে' উত্তম বার্তা হলো তৌহীদের বার্তা।

সমস্ত ধর্মের সারাংশ হলো তৌহীদ (একত্ববাদ)। ঈমানের মধ্যে সবচে' অধিক প্রাধান্য ও মর্যাদার অধিকারী হলো তৌহীদ।

কর্মসমূহ ও কর্মসমূহের সকল বিস্তারিত বিবরণের সাথে তৌহীদের একটি সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। এর মাধ্যমেই মানুষ দাসগণের দাসত্ব ও পূজো-বোধ থেকে মুক্ত হতে পারে।

তাশাহ্হুদ তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার সূরা আন'আমের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তেলাওয়াত করেন:

قل اننی هدٰنی ربی الی صراط مستقیم - دینا قیما ملة ابراهیم حنیفا -
وما کان من المشرکین o

قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العلمین o
لاشریك له - و بذلك امرت وانا اول المسلمین o

قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شیء - ولاتکسب کل نفس الا علیها - ولا
تزر وازرة وزر اخری - ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون o

[অর্থ: তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার প্রভু আমাকে সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করেছেন— সুপ্রতিষ্ঠিত দীনের দিকে, একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শের দিকে আর সে মুশরেকদের অন্তর্গত ছিল না।'

তুমি বল, 'নিশ্চয় আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সবকিছু আল্লাহ্র জন্য যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক;

তাঁহার কোন শরীক নাই ; এবং আমি ইহাই আদিষ্ট হয়েছি ; এবং আমি আত্ম-সমর্পণকারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম।'

তুমি বল, 'আমি কি আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্য কোন প্রভু-প্রতিপালক অন্বেষণ করব, অথচ তিনি প্রত্যেক বস্তুর প্রতিপালক ?' আর প্রত্যেক আত্মা যা কিছু অর্জন করবে উহার দায়িত্ব তার ওপরেই বর্তিবে এবং কোন ভারবাহী অন্যের ভার বহন করবে না। অতঃপর, তোমাদের প্রভুর দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তোমাদেরকে সেই বিষয়ে অবহিত করবেন যে-বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছ"।] (সূরা আন'আম ঃ ১৬২-১৬৫)

এর পরে হুযুর (আইঃ) বলেন ঃ

এবারকার বিদেশ ভ্রমণ থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে ইহা প্রথম খুতবা যা আমি আল্লাহ্র অনুগ্রহে লণ্ডন মসজিদে ফযল থেকে দিচ্ছি। খোদাতা'লার অনুগ্রহ ও কল্যাণে সব দিক থেকে এ ভ্রমণ সফলকাম হয়েছে। এখান থেকে যাবার পূর্বে যে খুতবা দিয়েছিলাম এর মধ্যে হযরত আকদস মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর যে একটি লেখা পেশ করেছিলাম। এর শেষ অংশ সম্পর্কে আমি বর্ণনা করছিলাম যে, আমি ইনশাআল্লাহ্তা'লা এ চারটি বিষয়ে, যা এর শেষ বাক্যে বর্ণিত হয়েছে এক একটি করে জামাআতের সামনে ব্যাখ্যা করবো। হযরত মসীহে মাওউদ (আঃ)-এর যে লেখা পেশ করেছিলাম তা এই ঃ

"আমাদের জামাআতের উন্নতিও ক্রমান্বয়ে ও 'কাযার'ইন' (ক্ষেত খামারের ন্যায়) হবে এবং ঐ উদ্দেশ্যাবলী ও লক্ষ্যসমূহ ঐ বীজের ন্যায় যা ভূমিতে বপন করা হয়ে থাকে। ঐ স্তর ও উচ্চ উদ্দেশ্যাবলী যার ওপরে আল্লাহ্তা'লা ইহাকে পৌঁছাতে চান তা এখনও অনেক দূরে। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ বিশেষত্ব সৃষ্টি না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তা লাভ হতে পারে না। আর ঐ বিশেষত্ব হলো এ সেলসেলার প্রতিষ্ঠার পেছনে খোদাতা'লার ইচ্ছা। তৌহীদের স্বীকারোক্তির মধ্যেও বিশেষ রং সৃষ্টি হোক (ইহা ঐ শেষ বাক্য যার কতিপয় দিককে এক এক করে আমি ইনশাআল্লাহ্ খুতবায় বর্ণনা করবো—প্রথম দিক হলো ইহা—তৌহীদের স্বীকারোক্তিতেও একটি বিশেষ রং সৃষ্টি হোক) দ্বিতীয়তঃ 'তাবাত্তল ইলাল্লাহ্' (সংসারমুক্ত হয়ে আল্লাহ্র দিকে ঝুঁকে যাওয়া) এক বিশেষ ধরনের হোক। তৃতীয়তঃ যিক্রে ইলাহীতে (আল্লাহ্র স্মরণে) একটি বিশেষ রং সৃষ্টি হোক এবং চতুর্থতঃ ভ্রাতৃত্বের অধিকার সংরক্ষণের একটি বিশেষ রং সৃষ্টি হোক"। (আল্ হাকাম ঃ ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৯ নম্বর, পৃষ্ঠা ৫, সংখ্যা ১৮, আগষ্ট ১৯০২ খৃষ্টাব্দ)

এর প্রথম দিক হলো তওহীদের স্বীকারোক্তিতে একটি বিশেষ রং সৃষ্টি হোক। আজকের খুতবার বিষয়-বস্তু ইহাই।

নাস্তিকতা অংশীবাদিতারই ফসল ঃ

আজ খোদাতা'লার অনুগ্রহে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া ইউ, কে-এর সালানা ইজতেমাও শুরু হতে যাচ্ছে আর তাদের পক্ষ থেকেও জোর আব্দার রাখা হয়েছে যেন এ জুমুআর

খুতবায় তাদের নামেও উদ্বোধনী রঙ্গে একটি বাণী প্রদান করা হয়। এরূপভাবে জামাআতে আহমদীয়া সুইজারল্যাণ্ডেরও সালানা জলসা আজ থেকে জুরিখে শুরু হতে যাচ্ছে। সুইজারল্যাণ্ডের জামাআতের আমীর সাহেব জুমুআর খুতবায় সুইজারল্যাণ্ড জামাআতকে স্মরণে রাখার জন্যে আবেদন করেছেন। এ উভয় স্থানে যেখানে এক জায়গায় ইজতেমা ও অন্য জায়গায় জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ সময়ে সেখানে অংশীবাদিতার আড্ডা বনে রয়েছে। যদিও শেরক্ (অংশীবাদিতা) বাহ্যতঃ অপসন্দনীয় মনে হয় তথাপি উহা নাস্তিকতায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আর ঐ এলাকার যুব-সম্প্রদায় এবং নতুন প্রজন্মের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সাধারণভাবে নাস্তিক হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃত বিষয় এই যে, নাস্তিকতা অংশীবাদিতারই ফসল। শেরক যখন খারাপ প্রতিক্রিয়া সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে তখন যে তিক্তফল শেরক বুকে ধরে তন্মধ্যে সবচে' তিক্তফল হলো নাস্তিকতা, কেননা শেরক নিজ অস্তিত্বের মধ্যে এর যোগ্য নয় যে, তার ওপরে ঈমান আনয়ন করা যায়। যে ঈমানই শেরক মিশ্রিত রাখা হয় উহা অবশ্যই নিম্নস্তরের ঈমান আর জাতিসমূহ যতই এই শেরকের বিভিন্ন দিকের প্রতি মনোনিবেশ করতে থাকে তারা তখন স্বভাবতই উহার প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে থাকে এবং উহার মোকাবেলায় আবার নাস্তিকতা ব্যতিরেকে তাদের নিকট আর কোন আশ্রয় অবশিষ্ট থাকে না। যদি নাস্তিকতাকে গভীর দৃষ্টিতে দেখা যায় তাহলে প্রকৃতপক্ষে খোদার পরে নাস্তিকতার আশ্রয়ই অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ হয় খোদা আছেন নচেৎ কিছুই নেই। যদি খোদা না থাকেন তাহলে জড়পূজা ব্যতিরেকে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। মানুষকে তার জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে অবশ্যই জড় পদার্থের দিকে ঝুঁকে পড়তে হয়। অতএব ইহা শেরকের ঐ এমন একটি রূপ যা কিনা মানুষকে বিশেষভাবে দুনিয়াদার বানিয়ে ছাড়ে এবং খোদার সাথে তার সম্পর্ক পরিপূর্ণভাবে ছিন্ন হয়ে যায়।

সবচে' জীবন প্রদায়িণী বাণী হলো তৌহীদের বাণী ঃ

এদিক থেকে এ দু'টো বিষয়ের সাথে আজকের খুতবার সম্পর্ক খুবই গভীর। অর্থাৎ তৌহীদের বিষয়-বস্তু। আর এরূপ দেশের ইজতেমাগুলো অথবা জলসাগুলো, যেখানে শেরকের আশ্রয়স্থল হয়ে গেছে এবং নাস্তিকতায় প্রবেশ করে উহা খেই হাড়িয়ে ফেলেছে। এসব দেশের জন্যে সবচে' গুরুত্বপূর্ণ, সবচে' প্রয়োজনীয়, সবচে' অধিক জীবন প্রদায়িনী বাণী হলো তৌহীদের বাণী। ইহা ব্যতিরেকে আমাদের তবলীগি প্রচেষ্টা একেবারে নিরর্থক ও তাৎপর্যহীন। এরূপ লোক, খোদার ওপর থেকে যাদের ঈমান উঠে গেছে, যাদের নিকট দুনিয়া খোদা বনে গেছে তাদের নিকট থেকে আপনি বাইবেলের শিক্ষানুযায়ী, হোক না তা পুরাতন বা নতুন অথবা অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থের শিক্ষানুযায়ী বিতর্ক করুন সেক্ষেত্রে ইহা ঐ কথার অনুরূপ হবে যেমন মইষের সামনে বাঁশী বাজানোর যে বাক্ধারা প্রচলিত রয়েছে তদনুরূপ। মইষ বেচারা

বাঁশীর কী বোঝে। এজন্যে অনেক আহমদী তাদের অনর্গল কথা যা কিনা এসব জাতির জন্যে বকবকানীর শামেল আর আমাদের নিকট খুবই তাৎপর্যবহ, অথচ তলিয়ে দেখলে এসব অনর্গল কথার মধ্যে নিজেদের সবটা সময় নষ্ট করে দেয়া হয় এবং তলায় কিছুই পড়ে না। এজন্যে রোগের প্রকৃত কারণ নির্ণীত হওয়া দরকার। আর রোগের সঠিক নিরূপণ ইহা যে, দুনিয়া থেকে তৌহীদ উঠে গেছে এবং এই নিরূপণই এসব রুগীদের ওপরে সত্যতার ছাপ রেখে দিচ্ছে। এরা ধর্মীয় ভেদাভেদ দেখছে না। ইহা ঐ নিরূপণ যা আজ সারা বিশ্বে সত্যতায় পর্যবসিত হয়ে আসছে। হিন্দুদের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখবেন সেখানে তৌহীদের কোন চিহ্ন থাকলেও তা উঠে গেছে। ইহুদীগণও কার্যতঃ তৌহীদকে পরিত্যাগ করে বস্তুপুজারী হয়ে গেছে। মুসলমানদের মধ্যেও কয়েক প্রকারের শেরক পথ করে নিয়েছে। আর মুসলিম রাষ্টগুলো তাদের স্থায়িত্ব খোদার তৌহীদের সাথে নয় বরং দুনিয়ার উপকরণসমূহ ও দুনিয়ার উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সম্পৃক্ত করে নিয়েছে। এই শেরক আদালতেও পথ পেয়ে গেছে আর সব জায়গায় আদালতের মূলসমুহ ঐ শেরকের কারণে ক্ষত-বিক্ষত করা হচ্ছে। কখনও কখনও আদালত একটি সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয় এবং সিদ্ধান্ত দেয়ার সময়ে প্রকাশ্যভাবে এমন ভাষা ব্যবহার করে থাকে যদ্বারা এ সিদ্ধান্তকে নীতিগতভাবে যথার্থতা প্রদান করলেও এর অভ্যন্তরে আরও কতিপয় উপাস্য থাকে যাদেরও পুজো করা হয়ে থাকে। কোথাও এরূপ এক মূর্তি আছে যে, সর্বসাধারণের ওপরে কী প্রভাব পড়বে যদ্বারা তাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে, কোথাও এরূপ যে, প্রশাসনের প্রধানগণের ওপরে কী প্রভাব পড়ে যায়, যারা আদালতে প্রভাবশীল বিচারকগণের পদোন্নতি দান করে থাকেন। কাউকে স্থায়ী বিচারক বনতে হবে, কাউকে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করতে হবে। তাহলে দেখা গেল যে, ইহা শেরকের খেলা যা সর্বদা মানুষের কাজ কর্মে বিষ মিশ্রিত করে যাচ্ছে। আর প্রকৃতপক্ষে কুরআন করীমে যথার্থই যে যুগ সম্বন্ধে কসম খেয়েছে যার মধ্যে ক্ষতিই ক্ষতি উহা এই যুগ এবং এ শেরেক যা সমগ্র বিশ্বকে ক্ষতির মধ্যে লিপ্ত করে দিয়েছে।

তৌহীদের বিষয়-বস্তুর তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা ঃ

তোহীদের ব্যাপারে এর আগেও আমি বক্তৃতার এক ধারা শুরু করেছিলাম, কিন্তু এ বিষয়-বস্তু এত তাৎপর্যপূর্ণ যে, বারে বারে ইহা জামাআতের সামনে আসা উচিত। আর খুবই বিস্তারিত বিবরণের সাথে প্রত্যেকটি বিষয়ে জামাআতের সামনে উপস্থাপন করা দরকার। কেননা এর মধ্যেই সমগ্র ধর্মের সারবস্তু। সমগ্র ধর্মের সংক্ষিপ্ত কথা তৌহীদের মধ্যেই নিহিত। তাই হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম দু'টি সময়ে (আরও সময় হতে পারে) কিন্তু দু'টি হাদীসই আমার দৃষ্টিপটে রয়েছে। কোন এক সময়ে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে এবং অন্য কোন সময়ে অন্য একজন সাহাবীকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর মধ্যেই সব কিছু নিহিত। যদি

তুমি-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হয়ে যাও আর এর ওপরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাও তাহলে জেনে রাখ যে, এর মধ্যে মুক্তিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সম্পর্কিত উপদেশের প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয় যে, হযরত উমর (রাঃ) যখন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে ইহা ঘোষণা করতে শুনেন যে—মান কালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ফা দাখালাল জান্নাতা—অর্থাৎ যে ব্যক্তিই একথা ঘোষণা করে বা স্বীকার করে যে, আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নেই সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।

তখন হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে ধরে (বলা হয় যে, বলার সময় জামার কলার ধরে ফেলেন) আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খেদমতে উপস্থিত করলেন এবং একথা নিবেদন করলেন, "হে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)! তিনি যে সব কথা বলছেন, ইহা কি আপনি বলেছেন"? তিনি (সাঃ) বল্লেন, "হ্যাঁ"। হযরত উমর (রাঃ) পুনরায় নিবেদন করলেন, "হে আল্লাহ্র রসূল (সাঃ)! এথেকে কোন কোন অনভিজ্ঞ অথবা অজ্ঞ লোক (শব্দ আমার সঠিকভাবে মনে নেই কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উদ্দেশ্য এই ছিল যে, কিছু লোক) ধোকায় পড়ে যাবে আর ধর্মের ক্ষতি হওয়ার আশংকা রয়েছে। ঐ লোক, যারা এর তাৎপর্য উপলব্ধি করবে না, তারা যেন অন্য আরও কিছু মনে না করে বসে।" সুতরাং হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম এ আবেদন নিবেদনের প্রেক্ষিতে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে এই ঘোষণা থেকে বিরত থাকতে বল্লেন।

দ্বিতীয় হাদীসে আঁ-হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে বর্ণনা পাওয়া যায় যে, এক যুবক সাহাবা (রাঃ) সওয়ারী হিসেবে তাঁর (সাঃ) পিছনে বসেছিলেন এবং তাকে তিনি (সাঃ) যে উপদেশাবলী দান করেছিলেন তন্মধ্যে একটি বিষয়ের বর্ণনা এরূপ ছিল অর্থাৎ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ সম্বন্ধে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আমি কি ইহা ঘোষণা করবো?" তখন রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বল্লেন, "না, সব লোক ইহা বুঝবে না, তারা ধর্ম-কর্ম করা ছেড়ে দেবে"। ইহা বলার উদ্দেশ্য এই যে, এ স্বীকারোক্তির তাৎপর্য অবশ্যই ইহা নয় যে, ধর্ম-কর্ম থেকে পৃথক হয়ে এই স্বীকারোক্তি করা হয় বরং এ স্বীকারোক্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, এ স্বীকারোক্তি কর্ম জীবনেও বাস্তবায়িত হতে হবে আর যদি এ স্বীকারোক্তি সত্য ও সঠিক হয় তাহলে অবশ্যই ইহা বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত হবে। ইহা বাস্তবে পরিণত না হয়েই পারে না। ইহা অসম্ভব যে, কেউ প্রকৃতই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে এর সত্যতা সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করছে, এর বিষয়-বস্তু বুঝে-শুনে স্বীকারোক্তি করছে এবং পরে ব্যবহারিক জীবনে তা পরিত্যাগ করে; কেননা তৌহীদের ব্যবহারিক দিকের সাথে এবং ব্যবহারিক দিকের বিস্তারিত বিবরণের সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এদিক থেকে জামাআতে আহমদীয়ার জন্যে তৌহীদ-এর বিষয়-বস্তুকে বারে বারে হৃদয়ঙ্গম করা ও লোকদের নিকট বর্ণনা করার বেশ প্রয়োজন রয়েছে।

ইসলাম তৌহীদের ওপরে খুব জোর দিয়েছে ঃ

আমি আপনাদের সামনে যে-আয়াত তেলাওয়াত করেছি এখন আমি এর অর্থ পেশ করবো। হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ জাল্লাশানুহ্ বলেন—কুল ইন্নানী হাদানী রাব্বী ইলা সেরাতিম্ মুস্তাকীম—অর্থাৎ হে মুহাম্মদ! ইহা ঘোষণা করে দাও যে, আমাকে আমার প্রভু-প্রতিপালক সরল-সুদৃঢ় পথের দিকে পথ প্রদর্শন করেছেন অথবা সরল-সুদৃঢ় পথে পরিচালিত করে দিয়েছেন। ঐ সরল-সুদৃঢ় পথে যা আমরা পাঁচ বারের নামাযে বারে বারে খোদার নিকট যাচ্ঞা করে থাকি যে, এহ্‌দেনাস সেরাতাল মুস্তাকীম—হে মুহাম্মদ! তুমি ঘোষণা করে দাও যে, আমি ঐ সরল-সুদৃঢ় পথ পেয়ে গেছি। আর উহা কি জিনিষ? দীনান কেয়ামান— প্রতিষ্ঠিত ধর্ম। মিল্লাতা ইব্‌রাহীমা হানীফা—একনিষ্ঠ ইব্‌রাহীমের ধর্মানুসারীরা যে ধর্মের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল—ইহা ঐ ধর্ম। ওমা কানা মিনাল মুশরেকীন--এর পরিচিতি যদি করে দেয়া হয় তাহলে এর সংক্ষিপ্ত সার উহা থেকে উৎকৃষ্টতর হতে পারে না যে, সে কোন দিক থেকেই অংশীবাদী ছিল না। ইসলাম তৌহীদের ওপরে যতখানি জোর দিয়েছে এর এক দশমাংশও অন্যান্য ধর্মে দেখা যায় না। অবশ্য কোন মুসলমানের ইহা দাবী করা যে, ইসলামই প্রথম বারে তৌহীদকে পেশ করেছে কোনক্রমেই সঠিক নয়, কেননা দীনান কেয়ামান — ঐ আয়াতে যে সম্পর্কে বলা হয়েছে এর পরিচয় অন্য স্থানে সূরা বাইয়্যেনাহ-এর মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লা বলে দিয়েছেন আর উহা এই— ওমা উমিরূ ইল্লা লেয়াবুদুল্লাহা মুখলেসীনা লাহুদ্দীনা হুনাফায়া ওয়া ইউকীমুস্ সালাতা ওয়া ইউতুয্ যাকাতা যালিকা দীনুল কাইয়্যেমাহ্— (আয়াত-৪)। দীনান কেয়ামান কি? উহা এই যে, ঐ সব ধর্ম যাদের ভিত্তি কেতাবের ওপরে রাখা হয়েছিল অর্থাৎ ঐশী বাক্যের ওপরে রাখা হয়েছিল। ঐসব ধর্মের সংক্ষিপ্ত কথা ইহা ছিল যে, তাদেরকে খোদাতা'লা তৌহীদ এবং বিশুদ্ধ তৌহীদের ওপরে যা একনিষ্ঠতায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল, যার মধ্যে ধর্মকে খোদার জন্যে বিশুদ্ধ করা হয়েছে—প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে। অতএব আদম থেকে নিয়ে হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সকল ধর্মের সারসংক্ষেপ ইহাই যা দীনান কেয়ামান-এর মধ্যে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। এজন্যে ইহা বলা সঠিক নয় যে, কেবল ইসলামই তৌহীদ উপস্থাপন করেছে। তৌহীদ ব্যতিরেকে তো ধর্মের শুরুই হতে পারে না। ইহা ঐ ধর্ম যা আদিতেও এবং অন্তেও। আদি ও অন্ত খোদারও দু'টি গুণ, এর চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ত সার হলো তৌহীদ। সুতরাং এর পরে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের এ আদেশ মিলেছে যে, এই ঘোষণা করো আর বলো যে, ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্‌ইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহে রাব্বিল 'আলামীন— ঐ তৌহীদ বিশুদ্ধ যাকে 'দীনান কেয়ামান' বলে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, যাকে একনিষ্ঠ

ইব্‌রাহীমের ধর্ম বলে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। উহা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের অস্তিত্বের মধ্যে কত উত্তমভাবে বিকশিত হয়েছে! আল্লাহ্ বলেন—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, হে মুহাম্মদ! তুমি ঘোষণা করো যে, ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী—আমার ইবাদতসমূহ ও আমার সর্বপ্রকার কুরবানীসমূহ — ওয়া মাহ্‌ইয়ায়া ওয়া মামাতী লিল্লাহে রাব্বেল'আলামীন—আর আমার সারা জীবনটাই—আমার জীবন-মরণ সব কিছু খোদার জন্যে উৎসর্গীকৃত। ইহা বিশুদ্ধ তৌহীদের স্বাভাবিক ফল এবং ইহা ঐ বিশুদ্ধ তৌহীদ যা হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম-এর স্বীকারোক্তিতে থেমে যায় নি এবং ঐ স্বীকারোক্তি তাঁর (সাঃ) সমগ্র অস্তিত্বে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে। যখন বিশুদ্ধ তৌহীদ সমস্ত অস্তিত্বে সঞ্চারিত হয়ে যায়, রক্ত প্রবাহে প্রবহমান থাকে তখন কীরূপ অস্তিত্বেরই না বিকাশ ঘটে! ইহা ঐ বর্ণনা যা ঐ আয়াতে পাওয়া যায় যে, ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহ্‌ইয়ায়া ওয়া মামাতী—তুমি বলে দাও যে, আমার ইবাদত—সর্ব প্রকার ইবাদত, আমার কুরবানী—সর্বপ্রকার কুরবানী আমার জীবন-মরণ সব কিছু খোদার জন্যে উৎসর্গীকৃত। চূড়ান্ত মর্যাদার সাথে গায়রুল্লাহ্ (খাদা ব্যতিরেকে অন্য কিছুকে উপাস্য স্বীকার করা)-কে এভাবে অস্বীকার করার উদাহরণ আপনারা অন্য কোন নবীর মধ্যে দেখতে পাবেন না, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তাঁরা তৌহীদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না। তৌহীদ স্তরে স্তরে উন্নতী করেছে। আস্তে আস্তে তৌহীদের মধ্যে নতুন মাহাত্ম্য সৃষ্টি হয়েছে। উহার তাৎপর্য অধিক গভীরতার সাথে মানুষকে বুঝান হয়েছে এবং ঐ পদ যার ওপরে হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)—কে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে উহা তৌহীদের চূড়ান্ত পর্যায়। অতএব যদিও সকল নবী তৌহীদের ঝাণ্ডাবাহী ছিলেন এবং তৌহীদের দিকেই আহ্বানকারী ছিলেন তথাপি নবী নির্বিশেষে এ দিক থেকে পার্থক্য রয়েছে। অতএব যেখানেই তৌহীদের বিষয়-বস্তু পাওয়া যায় সেখানে হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) ছাড়াও ইব্‌রাহীম (সাঃ)-এর নাম আপনারা শুনতে পাবেন আর এ দু'জন নবীই আছেন যাঁরা তৌহীদের বিষয়-বস্তুতে চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছে ছিলেন যেভাবে আকাশে চন্দ্র ও সূর্য থাকে। আর সব তারকারাজি যারা দূর থেকে ঝলমল তো অবশ্যই করতে থাকে; কিন্তু এরূপ উজ্জ্বল ও পবিত্র জ্যোতির অধিকারী হয় না যা চন্দ্রের লাভ হয়েছে বা যে-জ্যোতি সূর্য চন্দ্রকে প্রদান করে। অতএব তৌহীদের আকাশে সবচে' বড় যে দু'টি জ্যোতিষ্ক আছে আর যাঁদেরকে আমরা জ্যোতিষ্ক বলে থাকি তাঁরাই হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) ও হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)। আবার এ বর্ণনা 'কুল' অর্থাৎ তুমি বলো এর অধীনে প্রবহমান থাকে যে, হে মুহাম্মদ! এই ঘোষণা করো—ওয়া মামাতী লিল্লাহে রাব্বিল 'আলামীন লা শারীকা লাহূ—সার কথা উহাই যে, তাঁর কোন অংশীদার নেই; যেভাবে প্রথম আয়াতের ওপরে প্রতিফলিত হয়েছিল যে, ওমা কানা মিনাল মুশরেকীন। ঐ একই বিষয় যা

হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর অস্তিত্বের উদ্ধৃতি দিয়ে বুঝানো হচ্ছে যে, ইহা ঘোষণা করার পরে এই কথা বলা যায় যে, আমার সব কিছু খোদার জন্যে হয়ে গেল। পুনরায় সার কথা এই বের হলো যে—লা শারীকা লাহূ—তাঁর কোন অংশী নেই। ওয়া বেযালিকা উমিরতু ওয়া আনা আওওয়ালুল মুসলেমীন—আমাকে ঐ আদেশই দেয়া হয়েছে আর আমি প্রথম মুসলমান। অতএব যখন আমি ইহা বর্ণনা করেছি যে, তৌহীদের মধ্যেই খোদার 'অনাদি' হওয়ার গুণ প্রকাশিত এবং তৌহীদের মধ্যেই 'অনন্ত' হওয়ার বিষয়-বস্তু বর্ণিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর অস্তিত্বের উদ্ধৃতিতে এ দু'টো কথাই আঁ-হযরত (সাঃ)-এর মধ্যে পাওয়া যায়। তিঁনি (সাঃ) আদিতেও এবং অন্তেও। প্রারম্ভও তিনি এবং শেষও তিনি। এ দিক দিয়ে হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর অস্তিত্বের মধ্যে তৌহীদের জ্যোতিবিকাশ দেখানো হয়েছে। অন্য কারও সত্তার মধ্যে এরূপ জ্যোতি-বিকাশ পরিদৃষ্ট হবে না। কুল আগাইরাল্লাহে আবগী রাব্বান ওয়া হুয়া রাব্বু কুল্লে শায়ঈন —বলে দাও যে, খোদাকে ছেড়ে দিয়ে আমি কি অন্য কোন প্রভু-প্রতিপালক বানিয়ে নেব যখন তিনি নিজেই সব কিছুর প্রভু-প্রতিপালক। ঐ সত্তা কোথায় অন্বেষণ করবো যার প্রভু-প্রতিপালক খোদা নন, এ বিষয়-বস্তুই প্রকৃতপক্ষে বর্ণনা করা যাচ্ছে। যেদিকেই দৃষ্টি পড়ে সব কিছুর প্রভু-প্রতিপালক খোদাই। সমগ্র জগতে একটি অণুও এমন নেই যার প্রভু-প্রতিপালক খোদা নন। সুতরাং খোদাকে ছেড়ে তাদেরকে আমি কেন প্রভু-প্রতিপালক বানিয়ে নেব যাদের মাধ্যমে প্রতিপালকের গুণ বিকশিত হচ্ছে যখন যেস্থলে তিনিই আছেন তখন তিনিই আমার প্রভু-প্রতিপালক। তিঁনি ব্যতিরেকে কোন প্রভু-প্রতিপালক হতেই পারে না। ওয়া হুয়া রাব্বু কুল্লে শায়ঈন ওয়ালা তাকসেবু কুল্লু নাফসীন ইল্লা আলায়হা— এবং প্রভু-প্রতিপালক ছাড়া অন্য সৃষ্টির প্রশ্ন তাদের ওপরে এ বিধান প্রযোজ্য যে, ওলা তাকসেবু কুল্লু নাফসীন ইল্লা আলায়হা, কোন প্রাণী, কোন বুদ্ধিসম্পন্ন সত্তা এরূপ কোন কাজ করবে না যার সম্বন্ধে তাকে জিম্মাদার নির্ধারিত না করা হবে। লা তাকসিবু অর্থাৎ অর্জন করবে না। ইল্লা আলায়হা—উহার দায়িত্ব তার ওপরে বর্তাবে। অতএব ঐ শিরকের বিরুদ্ধে দু'টি দলীল বর্ণনা করা হয়েছে যে, খোদা ব্যতিরেকে আর কাউকে প্রভু-প্রতিপালক হিসেবে মান। প্রতিটি সত্তার প্রভু-প্রতিপালক খোদা। ইহা প্রথম দলীল। আর যে স্বয়ং এক প্রভু-প্রতিপালকের ভিখারী তার প্রভু-প্রতিপালক সাজার কোন অধিকারই নেই। দ্বিতীয় কথা এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি কারও না কারও নিকট প্রশ্নের সম্মুখীন আর আল্লাহ্ ঐ সত্তা যিনি কারও নিকট প্রশ্নের সম্মুখীন নন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁর কর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং তার মাশুল তাকে প্রদান করা হবে—ওয়ালা তাযেরু ওয়াযিরাতুঁ ভিযরা উখরা— এবং কোন আত্মা অন্য কোন আত্মার বোঝা উত্তোলন করতে পারবে না। কতিপয় লোক যেমন হিন্দুগণ ইহা বলে যে, আমরা তো তৌহীদের স্বীকারকারী এবং পরিশেষে খোদা

(অবশিষ্টাংশ ১৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পবিত্র রমযান ও আমাদের করণীয়ঃ

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলায়কুম ও রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আশা করি আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে কুশলেই আছেন। এখন পবিত্র মাহে রমযান। এই মাস ইবাদত বন্দেগীর মাস, বিশেষ করিয়া নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌তা'লার ফযল, রহমত ও নৈকট্য লাভের এক বিরাট সুযোগ বহন করিয়া আনে। রমযানের গুরুত্ব সম্বন্ধে কতিপয় হাদীস আপনাদের জ্ঞাতার্থে উদ্ধৃত করা হলো :

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন— যখন রমযান আসে, আকাশের দুয়ারসমূহ উন্মুক্ত হয় এবং জাহান্নামের দুয়ারসমূহ বন্ধ হয়, শয়তানদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় (অন্য বর্ণনায়—রহমতের দুয়ার উন্মুক্ত হয়)।

—বুখারী, মুসলিম

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যে ঈমানের সহিত এবং সওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখে, তাহার পূর্ব গুণাহ সকল মাফ হইয়া যায়। যে ঈমানের সহিত এবং সওয়াবের আশায় রমযানে নামায পড়ে তাহার পূর্ব গুণাহ সকল মাফ হইয়া যায়। যে ঈমানের সহিত এবং সওয়াবের আশায় কদরের রাত্রে নামায পড়ে, তাহার পূর্ব গুণাহ মাফ হইয়া যায়। —বুখারী, মুসলিম

উপরোক্ত রাবী হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক সৎকার্য দশ গুণ হইতে একশত গুণ বৃদ্ধি করা হইবে। মহান আল্লাহ্‌ বলিয়াছেন, রোযা ব্যতীত, কেননা তাহা আমারই জন্য এবং আমিই তাহার ক্ষতিপূরণ দিব। সে আমারই জন্য তাহার প্রবৃত্তি এবং খাদ্য ত্যাগ করে। রোযাদারের জন্য দুইটি আনন্দ— একটি আনন্দ ইফতারের সময় এবং একটি আনন্দ তাহার প্রভুর সহিত সাক্ষাতের সময়। নিশ্চয় রোযাদারের মুখের গন্ধ মেশ্‌কের সুগন্ধি হইতেও আল্লাহ্‌র নিকট অধিক উত্তম। রোযা ঢাল (স্বরূপ)। যখন তোমাদের কাহারও নিকট রোযার দিন উপস্থিত হয়, সে যেন মন্দ কথা না বলে এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার না করে। যদি তাহাকে কেহ তিরস্কার করে, সে যেন বলে, আমি রোযাদার।

বুখারী, মুসলিম

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, যখন রমযান মাসের প্রথম রাত্রি উপস্থিত হয়, অনিষ্টকর শয়তানদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় এবং দোযখের দরজা বন্ধ করা হয়। সুতরাং ইহার দরজা খোলা হয় না। জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা হয়, তাহার কোনও দরজা বন্ধ রাখা হয় না। একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করে, হে মঙ্গল অনুসন্ধানকারী! সামনে আস। হে অনিষ্টের অনুসন্ধানকারী! সংক্ষেপ কর। তাহারা আল্লাহ্‌র জন্য দোযখ হইতে মুক্ত। ইহা প্রত্যেক রাত্রে ঘোষণা করা হয়।

তিরমিযী

হযরত আনাস-বিন মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রমযানের প্রারম্ভে রসূল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, এই মাস তোমাদের নিকট উপস্থিত। ইহাতে এমন এক রাত্রি আছে যাহা এক হাজার মাস হইতেও উত্তম। যাহাকে ইহা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে তাহাকে সর্বপ্রকার মঙ্গল হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে এবং দুর্ভাগ্য লোক ব্যতীত আর কেহই ইহার মঙ্গল হইতে বঞ্চিত হয় না। (মেশকাত)

আল্লাহ্‌তা'লার নিকট তাই দোয়া করি তিনি যেন প্রত্যেক ভ্রাতা ও ভগ্নীকে এই পবিত্র মাসে অধিক হইতে অধিকতর কল্যাণ ও বরকত লাভের সুযোগ দান করেন। কুরআন শরীফ ও হাদীসের নির্দেশাবলীর আলোকে এই মাসে অধিক পরিমাণে সদকা ও দান-খয়রাত করা প্রয়োজন। হযরত রসূল করীম (সাঃ)-এর মহান আদর্শ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। তিনি রমযান মাসে ঝড়-তুফানের চেয়েও প্রবল গতিতে সদকা-খয়রাত করিতেন।

এই পবিত্র মাসে যাহাতে রীতিমত কুরআন শরীফের দরস দেওয়া হয়, সেই জন্য মুরব্বী ও মোয়াল্লেম সাহেবান যেন তাহাদের নিজ নিজ জামা'তে দরসের ব্যবস্থা করেছেন। প্রেসিডেন্ট সাহেবানও আশা করি তাদেরকে সাহায্য করছেন। যে জামা'তে কোন মুরব্বী বা মোয়াল্লেম নাই সে জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব স্বয়ং অথবা যে কোন একজন কুরআন জানা ভ্রাতা দ্বারা দরস দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। প্রত্যেকে কমপক্ষে দৈনিক এক পারা করিয়া নাযেরা কুরআন পাঠ করিতে সচেষ্ট হইবেন। এই ব্যাপারে কতটুকু বন্দোবস্ত করিয়াছেন তাহা পত্র দ্বারা অত্র অফিসে খাকসারকে অবহিত করিবেন।

প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ ও স্বগৃহে অবস্থিত ভ্রাতা ও ভগ্নী বিনা ব্যতিক্রমে যাহাতে রোযা রাখেন সেই সম্পর্কে আমীর/প্রেসিডেন্ট/মুরব্বী বা মোয়াল্লেম সাহেবান সযত্নে তদারক করিবেন। গ্রামবাসী যাহারা বার্ধক্য বা শারীরিক অসুস্থতার কারণে রোযা রাখিতে অক্ষম তাহারা জামা'তের ফাণ্ডে কমপক্ষে ৩০০/- টাকা ফিদিয়া জমা দিবেন। এই ফাণ্ডের টাকা প্রয়োজনমত সম্যক বা একাংশ রোযা চলাকালীন সময়ে স্থানীয় গরীব ভ্রাতা ও ভগ্নীদের মধ্যে সাহায্য হিসাবে বন্টন করিবেন বাকী উদ্বৃত টাকা কেন্দ্রে পাঠাইয়া দিবেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, তেজগাঁও, মোমেনশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া ও নারায়ণগঞ্জ-এর মত শহরে ফিদিয়া হইবে কমপক্ষে ৩৫০/- টাকা। আল্লাহ্ যাহাদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল করিয়াছেন তাহারা নিজেদের অবস্থানুয়ায়ী বর্ধিত হারে ফিদিয়া দিবেন। এইসব জামা'তের উদ্বৃত্ত ফিদিয়ার টাকা অত্র দপ্তরে পাঠাইবেন। এবারকার ফিৎরানা মাথা পিছু ২৪/- টাকা ধার্য করা হইল। (গমের চলতি মূল্য ধরিয়া এই নিরিখ ধার্য করা হইল)। ইহার অর্ধেক ১২/- টাকা। অবস্থানুযায়ী প্রত্যেকের জন্য পুরা বা অর্ধেক ফিৎরানা দেওয়া যাইবে। স্মরণ রাখিবেন, পবিত্র ঈদের দিন নামাযের পূর্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে এমন শিশুর জন্যও ফিৎরানা আদায় করিতে হইবে। যে জামা'তে ফিৎরানা গ্রহণ করার লোক নাই, অথবা ফিৎরানা বিতরণের

পর টাকা উদ্বৃত্ত থাকে সেই টাকা অত্র দপ্তরে পাঠাইবেন। ইহা ছাড়া আরও একটি উল্লেখ্য বিষয় এই যে, মোট আদায়কৃত ফিৎরানা হইতে শতকরা ১০ ভাগের এক ভাগ অত্র অফিসে অবশ্যই পাঠাইতে হইবে। অনুরূপভাবে যাহাদের উপর যাকাত ফরয তাহারাও এই পবিত্র মাসে যাকাত আদায়ে যত্নবান হইবেন। মনে রাখা দরকার, যাকাত আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত ফরয। যাহাদের উপর ইহা ফরয তাহারা ইহা আদায় না করিলে গুনাহগার হইবেন। এই বছর রমযান আমাদের জন্য আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের এক মহা সুযোগ আনয়ন করিয়াছে। তাই এই পবিত্র মাসে আমরা যেন বেশী বেশী করিয়া আল্লাহ্তা'লার তসবীহ্ তাহ্মীদ (পবিত্রতা এবং মহিমা) ঘোষণা করি।

সাধারণতঃ রমযান মাস নফল ইবাদত, যিক্রে ইলাহী ইত্যাদির এক বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে। সকল ভ্রাতা ও ভগ্নী নামায তাহাজ্জুদ, তেলাওয়াতে কুরআন, দরূদ শরীফ পাঠ, ইস্তেগফার, মস্নুন দোয়া ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্তা'লার সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য সর্বদা চেষ্টারত থাকিবেন এবং জামা'তের উন্নতির জন্য বেশী বেশী করিয়া দোয়া করিবেন। যেখানে সম্ভব তাহাজ্জুদ ও তারাবীহ্র নামায বা-জামাতের ব্যবস্থা করিবেন এবং জামাতের সকল ছেলে-মেয়েদিগকে লইয়া নামায পড়িবেন। যেখানে তাহাজ্জুদ নামায বা-জামাত পড়া সম্ভব নয় সেখানে অবশ্যই তারাবীহ্'র নামায বা-জামাত আদায় করিতে সচেষ্ট হইবেন। স্মরণ রাখিবেন, তারাবীহ্ নামায পড়ার পরও তাহাজ্জুদের নামায পড়া যায়। মোটকথা রমযান মাসে রাত্রিকে ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে জাগরূক রাখাই আঁ-হযরত (আঃ)-এর সুন্নত। মুসলিম উম্মাহ্ বড়ই সংকটের সম্মুখীন সুতরাং অন্যান্য দোয়ার সহিত মুসলিম উম্মাহ্র কল্যাণের জন্যও দোয়া জারী রাখিবেন!

রমযান মাসের শেষের ১০ দিনে হযরত রসূল করীম (সাঃ) ই'তেকাফ করিতেন ইহা বরকতপূর্ণ এবং জরুরী ইবাদত। প্রত্যেক জামা'তের বন্ধুরা যাতে ইহাতে শরীক হন উহার জন্য এখন হইতেই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। রমযান মাসে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কিতাব, যথাঃ কিশ্তিয়ে নূহ্, ইসলামী নীতি-দর্শন, বারাকাতুদ দোয়া ও সিলসিলার অন্যান্য পুস্তিকাদি যথা—আহমদীয়াতের পয়গাম, আল্লাহ্তা'লার অস্তিত্ব প্রভৃতি পুস্তকসমূহ বিশেষ মনোযোগ সহকারে নিয়মিত পাঠ করার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর খুতবা ও খুতবার ক্যাসেটসমূহ শুনিবারও ব্যবস্থা করিবেন।

বন্ধুগণকে ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, রমযানুল মুবারকে বান্দার দোয়া বিশেষভাবে কবুল হয়। তবলীগ ও ইসলাহের ময়দানে জামা'তের পূর্ণ কামিয়াবীর জন্য আপনারা ধৈর্য ও সহনশীলতার সহিত দোয়া করিতে থাকিবেন যেন আল্লাহ্তা'লা তাঁহার সকল বান্দাকে হেদায়াত দান করেন এবং দুনিয়ার অন্ধকার দূর করিয়া উজ্জ্বল দিনের উদয় করেন। বিশেষ করিয়া এই দোয়া করা উচিত যেন আমরা এই শতাব্দীতে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করিতে পারি। আল্লাহ্ যেন আমাদের সবার সংকল্পে দৃঢ়তা দান করেন।

ইহা ব্যতীত আমরা একটি বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তাহা হইল মালী কুরবানী, যাহার জন্য বিশেষভাবে এই পবিত্র রমযান মাসই উপযুক্ত সময়। প্রত্যেক ভ্রাতা ও ভগ্নীর নিকট বিশেষভাবে আবেদন জানাইতেছি যে, এই পবিত্র মাসে প্রত্যেকে নিজ নিজ সাধ্যমত আর্থিক কুরবানী দিতে বিশেষতঃ যাকাত, তাহ্‌রীকে জাদীদ ওয়াক্‌ফে জাদীদের সম্পূর্ণ চাঁদা এবং আমাদের জরুরী ফাণ্ড ও মসজিদ মিশন ফাণ্ডে সাধ্যমত চাঁদা আদায়ে যত্নবান হইবেন। **তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে রমযান শরীফে পূর্ণ চাঁদা আদায়কারীদের নামের তালিকা বিশেষ দোয়ার জন্য হুযূর আকদাস (আইঃ)-এর খেদমতে পাঠান হইবে।**

• আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)-এর পূর্ণ স্বাস্থ্য সুদীর্ঘ জীবন এবং সিলসিলার সকল মুরব্বী, মোয়াল্লেম, সর্ব শ্রেণীর ওহ্‌দাদার ও সকল ভ্রাতা-ভগ্নীর জন্য এবং বর্তমান শতাব্দীতে ইসলাম তথা আহমদীয়াতের বিশ্ব-বিজয়ের জন্য, বিশ্ব-শান্তি কায়েমের জন্য ব্যক্তিগত ও ইজতেমায়ীভাবে দোয়া জারী রাখিবেন।

এবার রোযা আমাদের জন্যে একটি নূতন প্রেক্ষাপটে আগমন করিয়াছে। আমরা ভীষণ মোখালেফাতের সম্মুখীন। বিরুদ্ধবাদীদের তুলনায় আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য অতীব ক্ষীণ। কিন্তু আমাদের আল্লাহ্‌ সর্বশক্তিমান। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সহযোগিতা আকর্ষণ করার উপযুক্ত সময় এই রমযান। তাই আপনারা সবাই দোয়ায় খুব জোর লাগান যেন ধাওয়াকে আমরা দোয়া দ্বারা পরাভূত করিতে পারি।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

একজনই। কিন্তু তারা মূর্তিগুলোর প্রতি যে-সব নাম আরোপ করে তাতে তারাও ছোট ছোট খোদা যারা আমাদের বোঝা উঠিয়ে নেবে। আমাদের পক্ষ থেকে খোদাতা'লার সকাশে সুপারিশ করে আমাদের পাপসমূহ মাফ করিয়ে দেবে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক রাখার কারণে আমাদের এইসব কল্যাণ লাভ হবে। যেভাবে আপনি একটি সওয়ারীর ওপরে বোঝা অর্পণ করেন সেরূপ তারাও আমাদের জন্যে সওয়ারীর ন্যায় খোদা পর্যন্ত আমাদেরকে নিয়ে যায় আর আমাদের বোঝা উঠিয়ে নেয়। এ ধরনের দার্শনিক জবাব দেবার চেষ্টা করা হয়। ইহা আমার নিজের অভিজ্ঞতা। খুব শৈশবকালে যখন আমি স্কুলে পড়তাম তখন একদিন ডালহৌসির একটি খুব সুন্দর জায়গায় ভ্রমণে গিয়েছিলাম এবং সেখানে একজন হিন্দুর সাথে তবলীগি কথাবার্তা হচ্ছিল। সে আমার নিকট যা বলেছিল ঐ কথাই আমার মস্তিষ্কে খোদিত হয়ে থাকল যে, এরা এভাবে শেরকের জন্যে বাহানা তৈরী করে থাকে। সে বল্ল, তোমাদেরকে তোমাদের খোদা পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্যে ওলী হয়ে থাকেন। এ মূর্তিগুলো কেবল এমন সব সত্তাদের প্রতিনিধিত্ব করে যারা নিজেদের অধীনস্থ লোকদেরকে খোদা পর্যন্ত নিয়ে যায় যারা তাদের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং ইহা শেরক নয়।

(চলবে)

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মতামতঃ

কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়কে সরকারীভাবে মুসলিম অথবা অমুসলিম ঘোষণাঃ অধিকার ও যৌক্তিকতা

মাযহারুল হক

"বাংলাদেশের একদল আলেম বা মুসলিম ধর্মীয় নেতা বাংলাদেশ আহ্‌মাদী সম্প্রদায়কে সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণা ক'রবার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানিয়ে আসছেন। এই নিবন্ধে আমি তা'দের উক্ত দাবীর তাৎপর্য্য ও তা'র যৌক্তিকতা এবং সরকার তা'দের দাবী মেনে নেবার নৈতিক ও যৌক্তিক অধিকার রাখেন কিনা—তৎসম্বন্ধে আলোচনা ক'রবো।

আহ্‌মাদী সম্প্রদায়কে সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণা ক'রবার দাবী নিছক একটি ঘোষণার জন্য দাবী জানানো নয়; বরং এর একটি বাস্তব পরিণতি র'য়েছে। আমাদিগকে সেই পরিণতির বিচারে এ দাবীর যৌক্তিকতা যাচাই ক'রতে হবে।

আহ্‌মাদী সম্প্রদায়কে সরকারী ভাবে অমুসলিম ঘোষণা ক'রবার পর সরকারের কাজ হবে — "আহ্‌মাদী সম্প্রদায় কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন মাজীদের তর্জমা ও তাফসীরকে বাযেয়াফ্‌ত করা, আহ্‌মাদী সম্প্রদায় কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তক বাযেয়াফ্‌ত করা, তা'দের জন্য কলেমা পড়া নিষিদ্ধ করা, মুসলিম নামে আত্ম-পরিচয় দেওয়া, বিসমিল্লাহ্‌, নামায, সালাত, রোযা, সিয়াম, হাজ্জ, ইসলাম, মাসজিদ, আযান, মুআয্‌যিন, খলীফা, রসূল, নবী ইত্যাদি শব্দাবলীকে অন্যান্য মুসলমানের ন্যায় ব্যবহার করাকে তা'দের জন্য নিষিদ্ধ করা, আস-সালামু আলাইকুম ব'লে কারো জন্য দোআ করাকে তা'দের জন্য নিষিদ্ধ করা এবং তা'দের ধর্মমত অন্যের কাছে প্রচার করাকে তা'দের জন্য নিষিদ্ধ করা।' কোনো আহ্‌মাদী উক্ত নিষেধাজ্ঞাসমুহের মধ্যে থেকে কোনো নিষেধাজ্ঞা অমান্য ক'রলে তা'কে কী শাস্তি দেয়া হ'বে— তা' নির্ধারণ ক'রে আইন প্রণয়ণ করাও সরকারের পরবর্তী কার্য্য হ'বে। উল্লেখ্য যে, যা'রা আহ্‌মাদী সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণা ক'রবার জন্য সরকারের কাছে দাবী জানিয়ে আসছেন, তা'দের দাবীর তাৎপর্য্য যে উপরোক্তরূপ, তা' তা'রা বিভিন্ন সময়ে তা'দের সভা-সমিতি ও সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা-বিবৃতি দ্বারাও প্রকাশ ক'রেছেন এবং এখনো ক'রছেন। তা' ছাড়া তা'রা তা'দের বক্তৃতা-বিবৃতিতে পাকিস্তানে আহ্‌মাদী সম্প্রদায় অমুসলিম ঘোষিত হ'বার কথা পুনঃপুনঃ উল্লেখ ক'রেছেন। আর পাকিস্তানে যুল-ফিকার আলী ভুট্টো ও যিয়াউল হকের শাসনামলে আহ্‌মাদী সম্প্রদায়ের প্রতি যে উপরোক্তরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছিল এবং এর ফলে তা'দের ওপর নানারূপ নির্য্যাতন নেমে এসেছিল, তা' এ দাবীকারক ধর্মীয় নেতাদের নিকট অবিদিত নয়। এতদ্দ্বারাও

প্রমাণিত হয় যে, আহ্‌মাদী সম্প্রদায়কে সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণা করিয়ে তা'রা আহ্‌মাদীদের ওপর উপরোক্তরূপ অবস্থা-ই আপতিত ক'রতে চাইছেন।

এখন বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রিয় বিবেকবান, মানবতাবাদী মানুষ ও সরকারকে বিবেচনা ক'রে দে'খতে হ'বে—আহ্‌মাদী সম্প্রদায়কে সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণা ক'রবার উপরোক্ত দাবীর পেছনে কতটুকু যৌক্তিকতা র'য়েছে এবং তা'দিগকে অমুসলিম ঘোষণা ক'রবার কতটুকু অধিকার সরকারের রয়েছে।

মানুষ বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তির অধিকারী। সে যতক্ষণ পর্য্যন্ত অন্যের ধর্মীয় অধিকারের ওপর, জীবনের ওপর অথবা সম্পত্তির ওপর হামলা না চালায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তা'কে বুদ্ধি ও চিন্তা শক্তির স্বাধীনতা দিতে হ'বে—এটা-ই মানব-বুদ্ধির স্বাভাবিক দাবী ও স্বাভাবিক যুক্তি। কুরআন মাজীদ একাধিক আয়াতে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার অপরিহার্য্যতাকে বর্ণনা ক'রেছে। যেমনঃ কুরআন মাজীদ বলে— "ধর্মে কোনো যবরদস্তী নেই। (২ঃ২৫৭)॥" কেউ তা'র ধর্মমত পোষণ, পালন ও প্রচার ক'রবার অধিকার আমার কাছে পা'বে কিনা—আমাকে তা' ঠিক ক'রবার পূর্বে আমার কাছে সে এ কথা প্রমাণিত ক'রতে যুক্তির দিক দিয়ে মোটে-ই বাধ্য নয় যে, সে আমার ধর্মমতের অনুসারী। অনুরূপভাবে 'আমি যে ধর্ম-গ্রন্থকে সত্য ব'লে বিশ্বাস করি, সেই ধর্ম-গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের যে ব্যাখ্যাকে আমি সঠিক ও অভ্রান্ত ব'লে বিশ্বাস করি, তা'র বিপরীত ব্যাখ্যা প্রদান ক'রবার অধিকার থেকে অন্য সকলকে গায়ের যোরে অথবা আইনের যোরে বঞ্চিত ক'রতে হবে বা বঞ্চিত করা যা'বে—এইরূপ ধারণা পোষণ করা আর যা'-ই হোক না কেন, যৌক্তিক ধারণা কোনক্রমে হ'তে পারে না। অনুরূপভাবে "আরবী, ফারসী অথবা অন্য কোনো ভাষার যে সকল শব্দকে আমি আমার ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার ক'রতে পারি, সেই সকল শব্দের ওপর আমার মীরাছী পাট্টা কায়েম হ'য়ে গেছে মনে ক'রে তা'দের ব্যবহার আমার বিরোধীদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা ক'রবার দাবী জানা'বো আর কোনো সরকার সেই দাবীকে মেনে নেবার অধিকার রাখে"—একথা যুক্তির কষ্টি-পাথরে মোটে-ই টেকে না। রেনেসাঁ-পূর্ব যুগে য়ূরোপে পাদরী সমাজ প্রায় প্রত্যেকটি নূতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যকে "বাইবেল-বিরোধী অতএব নিষিদ্ধ" আখ্যা দিয়ে ধর্মীয় ও জাগতিক সভ্যতার অগ্রগতিকে রু'খতে চেষ্টা ক'রেছিলো। নিজেদের বর্বর মানসিকতার কারণে পাদরীগণ ধর্মীয় স্বাধীনচেতা মনীষীদের ওপর এবং সত্যান্বেষী বৈজ্ঞানিকদের ওপর সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় যে বর্বর অত্যাচার চালিয়েছে, তা' আজ সভ্য য়ূরোপের কলঙ্কিত অতীত ইতিহাসরূপে ধিকৃত হ'য়ে থাকে। য়ূরোপের সৌভাগ্য এই যে, সে আজ পাদরীদের ধর্মীয় অত্যাচার, বর্বরতা তথা পর-মত-অসহিষ্ণুতা থেকে মুক্তি লাভ ক'রেছে। অবশ্য, এ মুক্তির জন্য তা'কে অনেক ধর্মীয় জুলুম-নির্য্যাতনের অগ্নি-পথ অতিক্রম ক'রতে

হ'য়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদিগকেও কি সেই অগ্নি-পথ মাড়া'তে হ'বে? নাকি আমরা য়ুরোপ থেকে শিক্ষা গ্রহণ ক'রবো?

"বিশ্ব-আহ্‌মাদী সম্প্রদায় সারা পৃথিবীতে (য়ুরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা ও এশিয়াতে) মানব জাতির নিকট ইসলাম তথা কুরআন মাজীদকে কীরূপে পেশ ক'রছে, আর এতে বিশেষতঃ পাশ্চাত্য জগতে ইসলামকে জানবার ও মানবার আগ্রহ দিন দিন কীরূপে বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর আহ্‌মদী সম্প্রদাই ইসলামের মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পশ্চিম দিক অর্থাৎ পাশ্চাত্য জগৎ থেকে ইসলামের সূর্য উদিত করাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিনা আর সর্বোপরি আহ্‌মাদী সম্প্রদায় প্রকৃত পক্ষে মুসলিম কিনা"—বক্ষ্যমান নিবন্ধে এইসব বিষয়ের আলোচনার প্রয়োজন নেই। আহ্‌মাদী সম্প্রদায়ের ধর্মমতের যারা বিরোধী তারা কখনো বলেনি যে, আহ্‌মদী সম্প্রদায় একটি সন্ত্রাসবাদী সম্প্রদায়। বস্তুতঃ আহমাদী সম্প্রদায় একটি শান্তি প্রিয়, শান্তিবাদী, নিরীহ ধর্মীয় সম্প্রদায়। আহ্‌মাদী সম্প্রদায়ের উক্ত পরিচিতিই তার পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ধর্মীয় অধিকার পাবার যোগ্য প্রমাণিত হবার জন্য যথেষ্ট যুক্তি। আহ্‌মাদী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস কোনো সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত সৃষ্টি করে কিনা—তা'র ওপর আহ্‌মাদী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও ধর্মীয় অধিকার পা'বার যোগ্য হওয়া নির্ভর করে না। আমি ব'লতে পারি—"যত ধর্ম-মত আমার ধর্ম-মতের বিরোধী, তা' আমার ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করে; সুতরাং অন্য সব ধর্ম-মতের পালন ও প্রচার গায়ের যোরে বা আইনের যোরে বন্ধ ক'রতে হ'বে।" অনুরূপভাবে প্রত্যেক ধর্মীয় দল, উপদল সরকারের কাছে দাবী জানা'তে পারে—"অমুক সম্প্রদায়ের ধর্মমত আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত করে; সুতরাং তা'দের ধর্মমতের পালন ও প্রচার বে-আইনী ঘোষণা ক'রো।" এমতাবস্থায় কোনো দেশের সরকার উক্তরূপ দাবী মেনে নিলে সে দেশ থেকে যে মানবতা তথা মানব-সভ্যতা বিদায় নেবে, যুক্তি দ্বারা তা' যারা বু'ঝতে সক্ষম নয়, পাকিস্তানের দৃষ্টান্ত থেকে সবক গ্রহণ ক'রতে তা'দিগকে অনুরোধ নানাই। মানব-সভ্যতা অবক্ষয় ও অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে পৌঁছে গেলে মানব-মণ্ডলীকে সভ্য ক'রতে যুগে যুগে মহামানবগণের আবির্ভাব ঘ'টেছে। তা'দের সবাই নবী-রসূল ছিলেন-আমি তা' বলছি না। এই সব মহামানবের অনুসারীদের সংখ্যা প্রথমে সর্বকালে অতি নগণ্য ও স্বল্প ছিল আর তা'দের মতামত সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুভূতিকে আহত ক'রেছে। এই সব আহত অনুভূতির লোকেরা যে সেই নিরীহ, নির্বিরোধ, দুর্বল সংখ্যা-লঘু লোকদিগকে বিনা প্রতিশোধে ছে'ড়ে দিয়েছে, তা' নয়; বরং তা'রা তা'দের সর্বশক্তি নিয়ে তা'দের ওপর ঝাঁপিয়ে প'ড়েছে আর তা'দের 'অপরাধের' কারণে তা'দের ওপর বর্বর অত্যাচার চালিয়েছে। পরিণামে কা'রা জয়ী হ'য়েছে,

(অবশিষ্টাংশ ২৭ পাতায় দেখুন।

লাপাত্তা 'ভগবান' ও চিনিহীন চিনিওটি

ক্লান্ত পথিক

"তাঁরা খুবই তৎপর। একেবারে উঠে পড়ে লেগেছেন বলা যায়। আঠারো বছর আগে শুরু করেছিলেন চি' চি করে। ক্রমেই বুলন্দ থেকে বুলন্দ হয়েছে তাদের আওয়াজ। এখন তা রীতিমত কর্ণবিদারী। সনাফ দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপ এখন প্রায় দানবিক লম্ফঝম্প। পবিত্র কুরআন, মহানবীর (সাঃ) হাদিস, শান্তির ধর্ম ইসলাম তাঁদের হাতে আজ জোড়া কুঠার-কিরিচ-ছোরা, রামদা, বোমা, পিস্তল, বন্দুক, কাটা রাইফেল, গজারীর লাঠির মতো শুধুই অস্ত্র। মিথ্যা, কুৎসা, খিস্তি-খেউড়, হিংসা-বিদ্বেষ, সংকীর্ণতা আর মধ্যযুগীয় মূঢ়তা তাদের রণধ্বনি। তাঁরা জিঘাংসু, আশু রণ প্রত্যাশী। এদেশের জনগণের আবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, আধুনিকতার সকল চেতনা, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের সকল আদর্শ ও মূল্যবোধ, সকল অর্জন, অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা সবই তাদের আক্রমণের লক্ষ্য। তাঁরা গিলে ফেলতে চান পবিত্র শহীদ মিনার, গুঁড়িয়ে দিতে চান মহান বিজয় স্তম্ভ, নিভিয়ে দিতে চান শিখা-অনির্বাণ। তাঁরা ছিঁড়ে ফেলতে চান আমাদের গর্বের ধন জাতীয় পতাকা, বন্ধ করে দিতে চান কোটি কোটি জন-নন্দিত মহান জাতীয় সঙ্গীত। তাঁরা যে কোন উপায়ে, যে কোন উছিলায়, যে কোন সুযোগে চান দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে। মানুষকে বিভক্ত করতে। সংঘাত বাধাতে, দেশকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে অন্তত কয়েক যুগ পিছনে, সাধের পাকিস্তানী আমলে, মোল্লাতন্ত্র-ফতোয়াতন্ত্র আর ইসলামের নামে রাজনৈতিক ধোকাবাজির 'হুকুমতে'।

নিজেদের তৎপরতা ও ক্রিয়াকলাপের দ্বারা এবং ধর্মীয় জলসা-'তফসির' মজলিস-এর নামে রাজনৈতিক প্রচার, জমায়েত গজারীর লাঠি মিছিল, শ্লোগান-উলম্ফন-দাপাদাপি ইত্যাদিতেও পরিস্থিতি যথেষ্ট উত্তপ্ত ও অনুকূল হয়ে উঠছে না মনে করলে তাঁরা মাঝে মাঝে সাহায্যের জন্য বাইরে হাত বাড়াচ্ছেন। বাইরে থেকে নিয়ে আসছেন একেক জন হরবোলা আদমীকে। বছর চার-পাঁচ আগে তাঁরা ভারত থেকে এক 'ভগবান' নিয়ে এসেছিলেন একেবারে বৌ-ছাওয়াল, মানে স্ত্রী কন্যাসহ। আশি-নব্বই কোটি মানুষ আর তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর দেশ ভারতে 'ভগবান' তো অগণিত রজনীশ-টজনীশের মতো বিখ্যাত না হলেও এ ভগবানেরও নাকি ভক্ত-অনুরাগীর সংখ্যা তুচ্ছ ছিল না। সবার মাথায় বাড়ি দিয়ে তিনি নাকি একদিন মুসলমান হয়ে যান এবং ইসলাম প্রচারের জন্য বাংলাদেশে চলে আসেন। তাঁকে পেয়ে এদেশী চিহ্নিত 'এসলাম পসন্দ'দের সে কী উল্লাস! তাঁর জন্য দেশের নানা স্থানে হতে লাগল শানদার জলসার এন্তেজাম। হাজার হাজার হাক্কানী আলেম, মোল্লা-মৌলবী, মওলানা-হযরত মওলানা, পীর-পীরানে পীর, শায়খুল ওয়ায়েছিন আমীর-নায়েবে আমীর, ছরদারে মারেফাত, আমীরে শরিয়ত ইত্যাদি অধ্যুষিত বারো কোটি ধর্ম প্রাণ মানুষের

এ দেশে জ'াকিয়ে বসে বেশ খোলতাই গলায় ইসলাম প্রচারের নামে নানা অভিনব বাণী দিতে লাগলেন সেদিনের নও-মুসলিম ঐ প্রাক্তন 'ভগবানটি'। নারায়ণগঞ্জে গিয়ে বলে দিলেন : এটা নারায়ণগঞ্জ কেন ? এ তো হিন্দু দেবতার নাম। এ শহরের নাম হোক নুরানীগঞ্জ। ধন্য ধন্য পড়ে গেল তাঁর মেজবান-আশেকানদের মধ্যে। মৌলবাদী মার্কা কাগজগুলোতে সবিস্তার খবরও বের হলো।

তারপরেই লাগল খট্‌কা। জনমনে প্রশ্ন উঠল : কে এই প্রাক্তন ভগবান ? ইসলাম প্রচার উদ্দেশ্য হলে ভারতই তো হওয়া উচিত তাঁর আদর্শ কর্মস্থল— যেখানে আশি-নব্বই কোটি জনসংখ্যায় ৬০/৭০ কোটি অমুসলিম। যে দেশের মানুষের শতকরা ৮০/৯০ জন মুসলিম সেখানে তাঁর মতো প্রাক্তন ভগবানের কি কাজ থাকতে পারে ? তাঁকে কারা কি উদ্দেশ্যে এখানে নিয়ে এসেছে ? নারায়ণগঞ্জকে নুরানীগঞ্জ, সীতাকুণ্ডকে ছকিনাকুণ্ড বানাবার জন্য ? সবচেয়ে বড় প্রশ্ন তিনি 'র'-এর লোক নন তো ? কিংবা মৌলবাদীদের আন্তর্জাতিক মুরুব্বীদের রিক্রুট করা কোন প্রশিক্ষিত তোতা পাখি ?

এর পরের কাহিনী সবারই জানা। এদেশ থেকে তল্পী গুটাতে বাধ্য হয়ে সেই যে মালয়েশিয়া না কোথায় গেলেন তার পর থেকে প্রাক্তন ভগবানটি লা-পাত্তা।

কিন্তু তাঁর অকাল বিদায় হতাশ বা হতোদ্যম করতে পারেনি সেই সব মহলকে যারা তাঁকে নিয়ে আসর জ'মাতে চেয়েছিলেন। এবার তাঁরা কয়েকজনকে নিয়ে এসেছেন একেবারে তাঁদের খাস পিতৃভূমি থেকে। বায়তুল মোকাররমের খতিব সাহেবকে একজন শ্রদ্ধেয় হক্কানী আলেম বলেই লোকে জানত। তাঁর জামাত কানেকশন সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে কথা উঠলেও অনুরাগীরা জোর দিয়ে বলেন যে, কোন দলীয় রাজনীতির সাথে তিনি যুক্ত নন। কিন্তু পাকিস্তানের মুলতানভিত্তিক সংগঠন 'তাহাফফুজে খতমে নবুওত' -এর শাখা খুললেন তিনি এদেশে। যার সদস্যদের মধ্যে রয়েছে '৭১-এর কুখ্যাত আল-বদররা ; পাকিস্তানের মাটিতে গিয়ে নামতেই তিনি অভ্যর্থিত হন তথাকার জামাতীদের দ্বারা, গোটা সফরকালেও পরিবৃত থাকেন মূলত তাদের দ্বারা। এখানে জামাতীরা কৌশলগত কারণে সামনে না এলেও খতিব সাহেবের অনুষ্ঠিত কর্মকাণ্ডের পিছনে তাদের দোয়া-মদদ ও সক্রিয় আনুকূল্য গোপন ছিল না। দেশপ্রেমিক জনগণের চাপে, মুক্তিযুদ্ধের ও স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিসমূহের প্রবল প্রতিরোধের মুখে মৌলবাদীরা কোণ-ঠাসা হয়ে পড়েছিল। পাকিস্তানের বিগত সাধারণ নির্বাচনে শূন্য (০) আসন পেয়ে, জর্দানের মতো আরব দেশ পর্যন্ত নির্বাচকদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে এবং লিবিয়া-সৌদী আরব ও উপসাগরীয় আরব দেশগুলোতে পর্যন্ত মৌলবাদীদের প্রতি মনোভাব কঠোর হয়ে ওঠার ফলে এদেশের জামাতী ও মৌলবাদী মহলে হতাশা ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা একটা ইস্যু চাচ্ছিল-রক্তপাত ঘটাবার, নৈরাজ্য সৃষ্টির, সংঘর্ষ বাধাবার মতো ইস্যু। যার সুযোগে নিজেদের অনিবার্য রাজনৈতিক বিপর্যয় ঠেকাতে পারে। ঠিক যেমনটি করেছিল তাদের গুরু মওদুদী ১৯৫৩ সালে, পাকিস্তানের পাঞ্জাবে কাদিয়ানী-অকাদিয়ানী দাঙ্গা বাধিয়ে হাজার হাজার নরনারী শিশু-বৃদ্ধের প্রাণহানি ঘটিয়ে। এখানে তারা ব্যাপারটা ঘটাতে চাচ্ছে হাক্কানী আলেম বলে পরিচিত কিছু ব্যক্তিকে সামনে রেখে-যারা সচেতন বা অচেতনভাবে এতে

শামিল হয়েছেন। এ কাজে তাদেরকে সহায়তা করার জন্য নিয়ে আসা হয় কয়েকজন পাকিস্তানী আলেম নামধারী ব্যক্তিকে। এঁদেরকে নাকি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেশের বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত সভা-সমাবেশে। এদের মধ্যে মশহুর একজন হলেন মাওলানা মঞ্জুর আহমদ চিনিওটি। চিনিওটি মানে চিনিমাখা ভাষণদানকারী নয়—পাকিস্তানী পাঞ্জাবের চিনিওট নামক স্থানের অধিবাসী। একটি জাতীয় দৈনিকে সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখলাম, চিনিওটি সাহেব এখন এদেশের বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে বক্তৃতা দিচ্ছেন। তাঁর চিনিহীন রসনা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও উস্কানির বিষ ছড়াচ্ছে। উক্ত প্রতিবেদনে আরও দেখলাম, চিনিওটি সাহেব একজন অর্থবাজ আর 'দাঙ্গাবাজ' মাওলানা হিসাবে চিহ্নিত। লাহোরের দৈনিক 'আফাক' পত্রিকার সম্পাদক শওকত হোসেন শওকত সম্প্রতি তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, 'মঞ্জুর অত্যন্ত স্বার্থপর, মিথ্যাবাদী ও ব্ল্যাকমেলার মাওলানা। তাঁর সাতটি পাজেরো গাড়ি রয়েছে। ব্যাংকে আছে কোটি কোটি টাকা। পাজেরো গাড়ি পাকিস্তানে সাধারণত মাদকদ্রব্য পাচারকারী ও গুণ্ডাদের অন্যতম বাহন। মঞ্জুর চিনিওটি জেনারেল মরহুম জিয়াউল হকের একজন সমর্থক।' অধমের প্রশ্ন হচ্ছে, এই চিনিওটি সাহেবদের মতো রত্নদের এদেশী ধর্মপ্রাণ সরল মানুষদেরকে হেদায়েত করার জন্য যাঁরা নিয়ে এসেছেন তাঁরা কোন রত্ন, কি ধরনের রত্ন? কেমন করে এঁরা অবাধে ঘুরে ঘুরে এদেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক বক্তব্য রাখেন? এদেশে কি সরকার বা প্রশাসন নেই? নেই কোন আইন-কানুন? এদেশটা কি দেশী-বিদেশী সব রকমের মেষ চর্মাবৃত হায়েনাদের অবাধ মৃগয়াক্ষেত্র?

বায়তুল মোকাররমের খতিব সাহেবের এক ভক্ত মওলানা সেদিন বললেন, পাকিস্তানী ভূত ছাড়াতে পাকিস্তানী ওঝা এসেছে, এতে দোষ কি? পাকিস্তানী ভূত বলতে তিনি কাদিয়ানীদের বুঝিয়েছেন। কিন্তু ওঝা হিসাবে যাদের আনা হলো আমার তো তাদেরকেই মনে হচ্ছে আরও বড় ভূত। প্রমাণ চিনিওটি সাহেব নিজেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, '৭১ সালে পাকিস্তানী সৈন্যরা ইসলামের স্বার্থেই বাংলাদেশে লড়াই করেছে।' মারহাবা! ছাদ মারহাবা!

এ ধরনের উক্তি যিনি করতে পারেন তাঁর ইসলাম এবং তিনি কেমন মুসলমান তা বুঝতে কারও অসুবিধা হবার কথা নয়। এরা ইয়াজিদের মতো, সীমারের মতো মুসলমান। এদের ইসলাম ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ জিইয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ধর্ম নির্বিশেষে লাখো লাখো নরনারী-শিশু হত্যার, নারী ধর্ষণের, লুঠতরাজ-অগ্নি সংযোগের, বাড়িঘর-শস্যক্ষেত্র দগ্ধ করার। এদের ইসলাম স্বার্থকে ধর্মের লেবাস পরাবার, মনুষ্যত্ব ও মানবতাকে কবরস্থ করার, হিংস্রতা ও রক্তলোলুপতার, মধ্যযুগীয় বীভৎসতা ও বর্বরতার। একইভাবে বুঝতে কারও অসুবিধা হবার কথা নয় এ ধরনের লোকদের যারা পরমাদরে ডেকে আনেন ও তাঁদের সাথে দহরম-মহরম করেন তাঁরা কে, কি ধরনের লোক এবং তাঁদের উদ্দেশ্য কি?

আশঙ্কার ব্যাপার এই যে, এঁরা ক্রমে একাট্টা হচ্ছেন। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের চেতনা, গণতন্ত্র, জাতীয় সংস্কৃতি ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধকে এবং এদেশের মানুষের আবহমান জীবনাচরণ ও ঐতিহ্যকে আবারও রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিতে শক্তি সংহত করছেন। আর এসব কিছুই তাঁরা করে যাচ্ছেন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একাংশের প্রকাশ্য ছত্রছায়া ও আনুকূল্যে"। (বিরস কাহিনী: ২০/১/৯৪ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

ধর্ম রক্ষার নামে সন্ত্রাসী উস্কানি

"গত শুক্রবার মজলিস-এ-তাহফুজ-এ খতমে নবুয়ত (বাংলাদেশ) নামের একটি তথাকথিত আন্তর্জাতিক ধর্ম ব্যবসায়ী সংস্থা মানিক মিয়া এভিন্যুতে এক সমাবেশের মাধ্যমে এ দেশের কাদিয়ানী মতাদর্শের অনুসারীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবি জানিয়েছে পাকিস্তানী কায়দায়। এ জন্যে তারা সরকারকে ছ'মাসের সময়ও বেঁধে দিয়েছে বলে খবরে প্রকাশ। আর সব-চেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হচ্ছে, ঐ সমাবেশের ঘোষণামতে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন সরকারি দলের পক্ষ থেকে জনৈক সংসদ সদস্যও নাকি তাদের দাবির সঙ্গে ঐক্যমতও পোষণ করেছেন। এছাড়া আরও যে বিপর্যয়কর ঘটনা ঘটেছে তা হচ্ছে বাংলাদেশের প্রধান জাতীয় মসজিদের সরকারি চাকুরে খতিবও এ সমাবেশে উস্কানিমূলক বক্তব্য রাখেন।

এ সমাবেশ থেকে পাকিস্তানী কায়দায় শুধু যে কাদিয়ানী মতাদর্শের অনুসারীদের অমুসলিম সংখ্যালঘু ঘোষণার দাবি জানানো হয়েছে তাই নয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট-কারী এবং সন্ত্রাস সংঘটিত হতে পারে এ রকম উস্কানিও প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, পাকিস্তানে জামাতীরা এই তথাকথিত রাজনৈতিক ইস্যু ও দাবি নিয়ে নৈরাজ্যিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিলো এর আগে এবং সেখানে তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও লাগিয়েছিলো। শুক্রবারের সমাবেশে পাকিস্তানের সেই সাম্প্রদায়িক উস্কানিদাতাও উপস্থিত ছিলো এবং তারা উর্দুতে বক্তব্য রাখে। জনৈক বক্তাকে তুরস্ক থেকে আগত বলে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় কিন্তু তিনি বক্তব্য দেন উর্দুতেই।

মজলিশ-এ-তাহফুজ-এ-খতমে নবুওত (বাংলাদেশ) এর নামে এই সমাবেশ ডাকা হলেও এর পেছনে জামাতীদের ছিল প্রত্যক্ষ সহযোগিতা এবং তাদের ধূর্ততাকে তারা চেপে রাখতে পারেনি। এর দেশি ও বিদেশি বক্তাদের বক্তব্য যে শুধু 'কাদিয়ানী'র ব্যাপারটির মধ্যেও সীমাবদ্ধ ছিলো তাই নয়, তারা বাংলাদেশের রাজনীতি এবং অর্থনীতি নিয়েও কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখে। এমনকি বায়তুল মোকাররম মসজিদের সরকারি বেতনভুক্ত খতিব বর্তমান সরকারকে কাদিয়ানী সরকার হিসেবে অভিহিত করেন।

উল্লেখ্য, এই সমাবেশের ঘোষণা দেয়ার পর এ সমাবেশের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে সরকারের একটি সমঝোতা হয়। সমাবেশ না করার ব্যাপারে এবং মানিক মিয়া এভিন্যুতে সমাবেশ না করার জন্যে সরকার নির্দেশ দান করেছিলেন। কিন্তু সে নির্দেশ লংঘিত ও সমঝোতার অবমাননা করা হলেও পুলিশ বাধা প্রদান করেনি। মূল্যবোধ বিনষ্টিকর সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে, এ সমাবেশে বিভিন্ন মাদ্রাসা এবং অন্যান্য দাতব্য প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রদের আনা হয়; এদের মধ্যে যুবকের চেয়ে কিশোর ও বালকের সংখ্যাই ছিল বেশি এবং তাদের হাতে হকিষ্টিক ও লাঠি ধরিয়ে দিয়ে তাদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করা হয়।

এ সমাবেশের মাধ্যমে বস্তুতপক্ষে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক বিকাশের আর

একটি প্রতিবন্ধক ইস্যুর সৃষ্টি করা হলো এবং যা করলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বে অবিশ্বাসী জামাত। আর সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপরটি হচ্ছে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষ থেকে এই সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক ইস্যুতে মদদ দেয়া হলো। আর এমন সময় এ কাজটি করা হলো যখন দেশে চলছে আন্তর্জাতিক একটি খেলার আসর। এই উস্কানি ও সাম্প্রদায়িকতা বিদেশী প্রচার মাধ্যমগুলো যেভাবে প্রচার করছে তা নিশ্চয়ই সম্মানজনক ভাবমূর্তি বাড়ালো না বাংলাদেশের।

নিশ্চয়ই বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্র চায় সুস্থ সুন্দর জীবন যাপনের জন্যে; গতিশীল অর্থনীতি এবং গৌরবময় সংস্কৃতির জন্যে। সামাজিক রাজনৈতিক সম্প্রতি বিনষ্ট হলে এসব কোনো কিছুই অর্জন করা সম্ভব হবে না। বাংলাদেশ একটি জাতি রাষ্ট্র। একে ধর্ম রাষ্ট্রে রূপদানের অপপ্রয়াস জাতীয় সংহতিকেই শুধু বিনষ্ট করবে না সরল ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যেও বিভ্রান্তি ছড়াবে; যা তাদের বিশ্বাসের পবিত্রতাকে বিনষ্ট করবে। আমাদের গণতান্ত্রিক সরকারের অন্ততপক্ষে বোঝা উচিত যে, কখনই এই সব সাম্প্রদায়িক নৈরাজ্যিক উস্কানিমুলক ব্যাপারকে প্রশ্রয় দিতে নেই, অপশক্তির লালন কখনোই শুভ পরিণতি বয়ে আনতে পারে না। জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাওয়াই হচ্ছে বর্তমানে সকলের কর্তব্য-এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানী রাজনীতির অপসংস্কৃতি এ দেশে ছড়িয়ে আর যাই হোক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না। এ রকম উদাহরণ বিশ্বের কোথাও নেই"।

(সম্পাদকীয়: ২৬-১২-৯৩ তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

---

২২ পৃষ্ঠার পর

এখানে সে ইতিহাস আলোচনা ক'রবার দরকার নেই। এই নিবন্ধটি প্রকৃতপক্ষে ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিতও নয়। তবে এস্থলে যে কথাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা' এই যে, মানব জাতির সভ্য অংশ সেই 'সত্য-গর্বী' সংখ্যা-গুরু জনগোষ্ঠিকে তা'দের তথা-কথিত সত্যপরায়ণতার জন্য ধিক্কার দিয়ে থাকে।

বর্তমান বাংলাদেশ সরকার আহ্‌মাদী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্বাধীনতার ব্যাপারে এ পর্যন্ত অস্পষ্ট নীতি অনুসরণ ক'রে আ'সছেন। জাতীয় সংসদে একটি ধর্মান্ধ পর-মত অসহিষ্ণু তথা-কথিত ধর্মীয় জামাআতের নেতা আহ্‌মদী সম্প্রদায়কে সরকারীভাবে অমুসলিম ঘোষণার মাধ্যমে তা'দিগকে তা'দের ধর্মীয় মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রবার উদ্দেশ্যে যে বিল উত্থাপন ক'রেছিলেন, তা'কে সরকারী দল গ্রহণ অথবা প্রত্যাখ্যান-কোনোটি-ই করে নি'। সরকারের উচিৎ ছিল—মানব-স্বাধীনতা-বিরোধী উক্ত বিলকে স্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান করা। ভবিষ্যতে '৭১-এর নর-ঘাতক উক্ত ধর্মব্যবসায়ী ফ্যাসিস্ত জামাআতটি অথবা অন্য কোনো ধর্মান্ধ ধর্মীয়-স্বাধীনতা-বিরোধী গোষ্ঠী যেন তা'দের ধর্মীয় ফ্যাসিবাদ কায়েম ক'রতে না পারে, তদ্বিষয়ে সরকার এবং সকল মানতাবাদী বিরোধী দলের সতর্ক, তৎপর ও সচেষ্ট থাকা কর্তব্য হ'বে ব'লে বিশ্বাস করি"।

(১৩-১-৯৪ তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

নতুন ইস্যু নতুন ফাঁদ

কামরুল ইসলাম

"আরো একটি নতুন ইস্যু-কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে। আচমকা এ ধরনের আন্দোলন দেখে অবাক হতে হয় এবং দেশের হাজারো রকম সমস্যার মধ্যে কাদিয়ানী সমস্যা কি খুব বড় একটা সমস্যা? নাকি তাকে বড় করে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। গত ২৪ ডিসেম্বর '৯৩ শুক্রবার বাদ জুমা মহাসম্মেলন হয়ে গেল। এই সমাবেশের উদ্যোক্তা ছিল 'তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত' নামে একটি সংগঠন। যতদূর শোনা যায় জামাতের একটি অঙ্গ সংগঠন এই খতমে নবুওয়ত। যার আমীর হচ্ছেন বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা ওবায়তুল হক। বায়তুল মোকাররমের মতো সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের খতিব কি এ ধরনের একটি মহাসম্মেলন আহ্বান করতে পারে না?

মহাসম্মেলন নিয়ে কারও আপত্তি থাকবার নয়। কিন্তু শুক্রবার কেন? তাও একেবারে বাদ জুমায়। মসজিদে একদিন ধর্মপ্রিয় মানুষ প্রার্থনার জন্য সমবেত হন। ঠিক সেদিন করার অর্থ হলো ধর্মপ্রিয় মানুষকে ধর্মের দোহাই দিয়ে সম্মেলনে উপস্থিত করা এবং ধর্মভীরু মানুষ সাধারণত মনে করে মসজিদের ইমাম বা খতিব এঁরা হলেন সৎ, সত্যবাদী, আদর্শবান, ধর্মনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ। সঙ্গত কারণে তাদের বক্তব্য ইসলামের বাণী হিসেবে সকলে মনে করেন এবং তাদের যে কোন আহ্বান ধর্মীয় আহ্বান হিসেবে মেনে নেন। সরলপ্রাণ মানুষদের এ কারণে ব্যবহার করা সহজ হয়। যখন সবাই শোনে জাতীয় মসজিদের খতিব হচ্ছেন এর মূল উদ্যোক্তা তখন স্বাভাবিকভাবে সরলপ্রাণ ধর্মভীরু মানুষ আকৃষ্ট হন এবং সেটাই হয়েছে। শুক্রবার বাদ জুমায় সরল সহজ ধর্মভীরু মুসল্লীদের বের করে নিয়ে আসা হয়েছে ইসলামের দোহাই দিয়ে। আরো একটা কথা বলা দরকার, প্রায়শ বাদ জুমায় জামাতের সমাবেশ হয় বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে। খতিবের প্ররোচনামূলক বক্তৃতার মাধ্যমে জামাতের সমাবেশে মুসল্লীদের সরবরাহ করা হয়। সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানের খতিব এ ধরনের কাজ অহরহ করে গেলেও তার বিরুদ্ধে কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। মসজিদকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা জামাতের সবসময়ের কাজ এবং বিশেষ করে বায়তুল মোকাররমকে দলীয় কার্যে ব্যবহার করার সুপরিকল্পিত আয়োজন চলছে। সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে মসজিদের পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখার এবং বর্তমান জামাতের মদদপুষ্ট খতিবকে অপসারণ করা একান্ত জরুরী।

বেশ কিছুদিন ধরে একটা পোষ্টার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। ২৪ ডিসেম্বর মহাসম্মেলন। উদ্যোক্তা তাহাফফুজে খতমে নবুওয়াত নামক একটি অঙ্গসংগঠন। উদ্বোধক হচ্ছেন বাংলাদেশের

রাষ্ট্রপতি আব্দুর রহমান বিশ্বাস। উনি মহাসম্মেলনে উপস্থিত হন্ নি। আগেই নাকি অপারগতা প্রকাশ করেছেন। তাই যদি হয়ে থাকে তবে দেশের সর্বপ্রধান একজন ব্যক্তির নাম পোষ্টারে যায় কিভাবে? নাকি তাঁকে অবহিত করার আগেই পোষ্টারে তাঁর নাম ছাপা হয়ে গিয়েছে। এটাই যদি হয় তাহলে পোষ্টারে তাঁর নাম ব্যবহার করার অপরাধে কি কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা আজ সকলের জিজ্ঞাস্য। কারণ দেশের সর্বপ্রধান ব্যক্তির নাম পোষ্টারে থাকার অর্থই হলো সেদিকে জনগণ আকৃষ্ট হবে। যদি এমন হয় যে, রাষ্ট্রপতি জানেন না তাঁর নাম ব্যবহার করা হয়েছে তাহলে ধরে নিতে হবে, সাধারণ মানুষকে ভাওতা দেওয়া হয়েছে। ভাওতাবাজি দিয়ে আর যাই হোক জনগণের দৃষ্টি বেশী দিন ধরে রাখা যায় না। তাহলে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান স্বৈরাচারী এরশাদ থাকতেন।

এখন একটু মূল আলোচনায় ফিরে আসতে চাই। পৃথিবীর যে কোন লোকের অধিকার রয়েছে নিজস্ব ধর্মচর্চা করার এবং প্রত্যেক ধর্মই একে অপরের মধ্যে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার কথা বলে। যেমন 'ক্ষুধার্তকে অন্নদান কর, রোগীর শুশ্রূষা কর, নিরপরাধ কয়েদীকে কারামুক্ত কর এবং নিপীড়িত ব্যক্তি যে ধর্মাবলম্বী হউক না কেন তাহাকে সাহায্য করিও।' (আল হাদিস-তথ্য ইসলামের বাণী-কাজী আব্দুল আলীম সংকলিত, পৃঃ ২৮৮)। তাহলে ধরে নেয়া যাচ্ছে যে, ইসলাম সকল ধর্মের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির কথা বলে। সংগত কারণে বলতে হয়, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ নয়, ধর্মে ধর্মে হানাহানি নয়, বর্ণে বর্ণে বিরোধ নয়—আমরা সবাই মানুষ এ বোধ সকলের মধ্যে তৈরী করতে হবে। কিন্তু হীন স্বার্থে যদি কেউ ধর্মকে ব্যবহার করে তবে নিশ্চয়ই সকলের প্রতিবাদ করা উচিত সমস্বরে। কারণ এই সম্মেলন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করেছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার উদ্যোগ নস্যাৎ করা নাগরিক হিসেবে সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য। দেশের সংবিধান ও জাতিসংঘ সনদে প্রত্যেকের অধিকার দেওয়া হয়েছে স্বীয় ধর্মচর্চা করার। তাকে বাধা দেওয়া মানবতা বিরোধী জঘন্য অপরাধ।

ধরে নেওয়া গেল কাদিয়ানীদের কার্যকলাপ ও বিশ্বাস ইসলাম সম্মত নয়। তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে বলতে হয় তারা এমনি অমুসলিম। তাকে নিয়েতো এতোবড় হৈ চৈ করার কোন দরকার নেই। আর যারা করেছেন তাদের কি ধর্ম কর্তৃক সেই বিধান দেওয়া হয়েছে 'কে মুসলমান নয়, আর কে মুসলমান তা নির্ণয় করার।' সত্যিকার অর্থে কে মুসলমান আর মুসলমান নয় তা নির্ধারিত হবে হাশরের ময়দানে। সৃষ্টিকর্তাই একমাত্র বিচারক। নিশ্চয়ই কোন মুসলমান বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না তিনিই একমাত্র মুসলমান। ধর্মই যখন এতোসব কথা বলছে বা উল্লেখিত আছে, সেখানে এই ধরনের কার্যকলাপের আসল উদ্দেশ্যই বা কি?

লক্ষ্য করুন সারাবিশ্বে সাম্প্রদায়িক দলগুলোর অবস্থা। আমাদের পাশেই বিজেপির ভরাডুবি। পাকিস্তানেও জামাতের এই অবস্থা এবং আমাদের দেশে জামাতের দুরবস্থা।

ঠিক সেই মুহূর্তে নতুন করে একটা ইস্যু তৈরী করে জনগণের দৃষ্টিকে সেদিকে আকৃষ্ট করাতে চায়। পাকিস্তানে কাদিয়ানীবিরোধী তৎপরতার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে জামাতের একটি সুপরিকল্পিত আয়োজন চলছে। কাদিয়ানি বিরোধী আন্দোলন একেবারেই নতুন নয়। জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মওদুদী এই তৎপরতার সূত্রপাত ঘটান। ১৯৫৩ সালে সৃষ্ট কাদিয়ানি-বিরোধী দাঙ্গায় হাজার হাজার কাদিয়ানী নিহত হলে পাকিস্তান সরকার বিশেষ ট্রাইবুন্যাল গঠন করে। বিশেষ তদন্তের প্রেক্ষিতে জামাত নেতা মওদুদীকে গ্রেফতার ও বিচারে তার ফাঁসি সাব্যস্ত হয়। শেষতক মওদুদীর ক্ষমাভিক্ষা ও বিশেষ মহলের চাপে মওদুদীর ফাঁসি কার্যকর না হলেও ইতিহাসের এ দৃষ্টান্ত সকলের জানা। জামাতের সামনে জনগণকে দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর মতো তেমন কোন কর্মসূচী নেই। বাবরী মসজিদ ধ্বংস হওয়ার ঘটনায় ইতোপূর্বে ফায়দা লুটার চেষ্টা করলেও জনগণের সচেতনতায় তারা ব্যর্থ হয়। বেশ কিছু কাল আগে কাদিয়ানীদের মসজিদে হামলা করে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং প্রচুর সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করা হয়। বিবেকবান সব মানুষ এই ঘটনায় অবাক হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত জামাত এটাও কাজে লাগাতে পারেনি। কিছুদিন আগে জামাতের ছাত্র সংগঠন শিবির উপর্যুপরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সন্ত্রাস করেও তাদের করতলে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। বার বার জামাত ইসলামীর চক্রান্ত ফাঁস হবার পর এবার তারা নতুন আর একটা ফাঁদ পেতেছে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করতে হবে। জনগণকে ধোঁকা দিয়ে আর যাই হোক বেশী দিন টিকে থাকা যায় না—জনগণই তা বয়কট করে।

বর্তমানে দেশে অসংখ্য সমস্যা আছে, যেগুলো মানুষের প্রাণের সাথে সম্পর্কিত। শ্রেণী পেশার সকল মানুষ নিজস্ব দাবী-দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করতে তৎপর। মিল কল-কারখানা লে-অফের ঘটনায় সকলে ক্ষুব্ধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সন্ত্রাসী ঘটনায় সকলের জীবন অতিষ্ঠ, অর্থাৎ বাঁচা মরার আন্দোলনকে বাদ দিয়ে কে মুসলমান আর মুসলমান নয়—এ ধরনের আন্দোলন নিছক রাজনৈতিক ভাওতাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্মেলনে মাওলানা আমিনুল ইসলামের বক্তব্য সে কথারই প্রতিধ্বনি। কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার দাবীই হবে আগামী নির্বাচনে ইস্যু। সামনে মেয়র নির্বাচন এবং এই নির্বাচনে জামাতে ফায়দা লুটার এক সুপরিকল্পিত আয়োজন করছে, তা তাদের বক্তব্যেই বোঝা যায়। কিন্তু ধাপ্পাবাজি দিয়ে যে খুব বেশী লাভবান হওয়া যাবে না তা বোধ করি বার বার বলার প্রয়োজন রাখে না। তবে এ মুহূর্তে সকলকে সজাগ থাকতে হবে। কাদিয়ানীবিরোধী তৎপরতার অংশ হিসেবে আগামীতে যাতে জামাত কোন ধরনের দাঙ্গা সৃষ্টি করতে না পারে। আমাদের সকলেরই মনে রাখা দরকার যে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সকলেই মানুষ, মানবতাই হচ্ছে আমাদের মূল ধর্ম। অর্থাৎ ধর্মের মূল নির্যাস হচ্ছে মানবতা, মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখা। সঙ্গত কারণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার যে কোন চক্রান্তে রুখে দাঁড়ানো নাগরিক হিসেবে সকলের দায়িত্ব। আসুন আমরা সকলে সেই দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হই"।

(৭-১-৯৪ তারিখের দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

জামাতে ইসলামীর নোতুন চক্রান্ত

বদরুদ্দীন উমর

"দেশের জনগণ যখন নানা গুরুতর সমস্যার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, যখন এ সব সমস্যার সমাধানই হচ্ছে বর্তমান মুহূর্তের সব থেকে জরুরী কাজ সে সময়ে জামাতে ইসলামী তাদের পাকিস্তানী মুরুব্বীদের নির্দেশে এবং অনুকরণে বাংলাদেশে কাদিয়ানীদেরকে অমুসলমান ঘোষণার জন্য এক তথাকথিত কর্মসূচী ঘোষণার করেছে। এই কর্মসূচী অনুযায়ী তারা ২৪ শে ডিসেম্বর ঢাকায় এক "মহাসম্মেলন" আহ্বান করেছে।

এই সম্মেলন আনুষ্ঠানিকভাবে আহ্বান করা হয়েছে 'তাহাফফুজে খতমে নবুওয়ত' নামে জামাতে ইসলামের একটি অঙ্গসংগঠনের দ্বারা। এই সংগঠনটির আমীর হলেন বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব মওলানা ওবায়দুল হক। এই ওবায়দুল হক জামাতে ইসলামীর একেবারে নিজস্ব লোক। এঁর কারণেই বায়তুল মোকাররম মসজিদটি বেশ কিছুদিন থেকে জামাতে ইসলামীর একটি আখড়ায় পরিণত হয়েছে এবং সেইভাবেই এই মসজিদটিকে জামাতে ইসলামী তার হীন রাজনৈতিক কাজে ব্যবহার করে আসছে।

খুব ঘন ঘন বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে, জামাতে ইসলামী যে জমায়েত করে সেই জমায়েতের জন্য এই মসজিদের ভিতরে নামাজ পড়তে আসা মুসল্লীদেরকে সরবরাহ করা হয়। এই ব্যাপারটি ঘটে মসজিদের ভিতরে ধর্ম শিক্ষা ও প্রচারের নামে খতিব ওবায়দুল হকের প্ররোচনামূলক বক্তৃতার মাধ্যমে।

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, খতিব এই সব কাজ নিয়মিতভাবে করে গেলেও সরকারের পক্ষ থেকে তার কোন বিরোধিতা অথবা তার জন্য খতিবকে সরকার কর্তৃক তাঁর পদ থেকে অপসারণ করা হয় না, যদিও খতিবের নিয়োগ ও অপসারণের ব্যাপারটি সরকারের হাতেই। এর থেকে যে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বোঝা যায় তা হলো খতিবের এই জামাতী রাজনীতি মসজিদের মধ্যে চালানো সম্ভব হয় সরকারী সহায়তায়। এই সহায়তার দ্বারা উৎসাহী হয়েই তারা আহমদিয়াদের বিরুদ্ধে আহূত ২৪শে ডিসেম্বরের 'মহাসম্মেলন' উদ্বোধনের জন্য বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট স্বনামধন্য আবদুর রহমান বিশ্বাসকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু পরোক্ষভাবে এবং কিছুটা গোপনে জামাতীদের এই ধরনের তৎপরতাকে ভ্রাতৃপ্রতিম সাহায্য দিয়ে এলেও তাদের সাথে সরাসরি ও খোলাখুলি দাঁড়ানো সরকারের পক্ষে বর্তমান পরিস্থিতিতে অসুবিধাজনক। এ কারণে আবদুর রহমান বিশ্বাস আনুষ্ঠানিকভাবে 'তাহাফফুজে খতমে নবুওযত'-এর তথাকথিত এই মহাসম্মেলন উদ্বোধন করতে নিজের অপারগতা জানিয়েছিলেন।

কিন্তু এই অপারগতা সত্ত্বেও এই সম্মেলনের লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সাথে সরকারের কোন বিরোধ যে নেই, উপরন্তু এর সাথে তারা যে একাত্মতা বোধ করে এটাও বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, সরকার এই ধরনের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী একটি জমায়েত মহা-সম্মেলনের নামে অনুষ্ঠানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা না করে সেটা হতে দিচ্ছে এবং তা হচ্ছে এমন একজনের নেতৃত্বে যিনি প্রকৃতপক্ষে একজন সরকারী কর্মচারী এবং এমন একটি মসজিদের খতিব যে মসজিদকে জাতীয় মসজিদের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। জামাতে ইসলামীর কাদিয়ানী বা আহমদিয়া বিরোধী তৎপরতা কোন নোতুন ব্যাপার নয়। জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওদুদীই কাদিয়ানী বিরোধী এই তৎপরতার সূত্রপাত ঘটান পাকিস্তানী আমলে। তাদের কাদিয়ানী বিরোধিতা মওদুদীর নেতৃত্বে এমন পর্যায়ে যায় যে, ১৯৫৩ সালে তারা পাঞ্জাবের একাধিক জায়গায়, বিশেষতঃ লাহোরে, এক বিরাট কাদিয়ানী বিরোধী দাঙ্গা বাধায় যে দাঙ্গায় হাজার হাজার কাদিয়ানী নিহত হন, লাহোরে কাদিয়ানীদের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি বিনষ্ট হয় এবং কয়েকদিন ধরে সেখানে সৃষ্টি হয় এক নৈরাজ্যিক পরিস্থিতি।

খাজা নাজিমুদ্দীন সে সময় ছিলেন পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী। জামাতে ইসলামীর এই দাঙ্গার তদন্তের জন্য পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি মুনীরের সভাপতিত্বে সরকার একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করেন এবং জামাতে ইসলামীর নেতা দাঙ্গাবাজ মওদুদীকে গ্রেফতার করা হয়।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী এবং ১৯৯১-এর নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকার যেখানে জামাতের নেতা গোলাম আজমের বিরুদ্ধে কোন ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ আদালত গঠন করতে একেবারেই গররাজী সেখানে পাকিস্তানী সরকারের মতো একটি প্রতিক্রিয়াশীল সরকার জামাত সৃষ্ট পাঞ্জাব দাঙ্গা ও বিশেষভাবে মওদুদীর বিচারের জন্য গঠন করেছিলো সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিচারক দিয়ে একটি বিশেষ আদালত।

সেই ট্রাইব্যুনালে দাঙ্গার ওপর বিস্তারিত তদন্তের ভিত্তিতে বিচার অনুষ্ঠিত হয়েছিলো এবং সেই বিচারে মওদুদীকে পরিপূর্ণভাবে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে মৃতুদণ্ড দেওয়া হয়েছিলো। তাছাড়া সেই তদন্ত কাজের ও বিচারের মাধ্যমে জামাতে ইসলামী এবং তার নেতা মওদুদীর চরম গণবিরোধী, এমনকি ধর্মবিরোধী, ইসলামবিরোধী তৎপরতার বহু দিকও উদঘাটিত হয়েছিলো।

মওদুদীর ফাঁসির আদেশ রহিত করার জন্য মওদুদী সরকারের কাছে দয়াভিক্ষা করলে পরে শাসক শ্রেণীর শক্তিশালী কোন কোন অংশের সুপারিশে সে আবেদন মঞ্জুর করা হয় এবং মওদুদী ফাঁসির হাত থেকে রক্ষা লাভ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জামাতে ইসলামী এবং মওদুদীর চরিত্র যেভাবে ১৯৫৩ সালের দাঙ্গা তদন্তের বিচারের মাধ্যমে উদঘাটিত হয়েছিলো সেটা পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে ছিলো এক অতি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। পাকিস্তানের কলঙ্কজনক বহু ঘটনার পাশাপাশি সেটা ছিলো জনগণের জাগ্রত বিবেকের এক নিশ্চিত অভিব্যক্তি।

পাকিস্তানে জামাতে ইসলামী একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে মার খাওয়ার পর নির্বাচনে তাদের ভরাডুবীর পর, এখন তারা আবার নোতুন করে আসর জমানোর উদ্দেশ্যে কাদিয়ানীবিরোধী আন্দোলন শুরু করেছে। বাংলাদেশের জামাতে ইসলামী, তার আমীর গোলাম আজম এবং তাদের দুর্বৃত্ত চরিত্রসম্পন্ন অন্য নেতারা এখন পাকিস্তানের জামাতে ইসলামীর সাথে তাল রেখে এখানে কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে এই বলে আন্দোলন শুরু করেছে যে, তারা মুসলমান নয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে অর্থাৎ সরকারীভাবে তাদেরকে অমুসলমান ঘোষণা করতে হবে।

কে খেতে পাচ্ছে এবং কে খেতে পাচ্ছে না, কার ঘরে খাবার এবং মাথার ওপর ছাদ আছে কি নেই তার হিসেব বাদ দিয়ে কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয়, এই ইস্যু তুলে জামাতে ইসলামী এখন বাজার গরম করার চেষ্টায় আছে। এই ইস্যুকে অবলম্বন করে তারা রাজনৈতিকভাবে নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে চাইছে। কিন্তু তাদের জন্য দুঃখজনক হলেও এটা এক সুখের ব্যাপার যে সব রকম সরকারী সাহায্য সহযোগিতা, পেট্রো ডলার এবং সাধারণভাবে প্রতিক্রিয়াশীলদের সমর্থন সত্ত্বেও জামাতে ইসলামীর পক্ষে এ দেশে রাজনৈতিক অগ্রগতি অর্জন সম্ভব নয়।

কিছুদিন আগে জামাতে ইসলামীর গুণ্ডারা আহমদিয়াদের কেন্দ্র আক্রমণ করে সেখানে রক্ষিত বহু ভাষায় প্রকাশিত কোরানের শত শত কপি আগুনে পুড়িয়ে এবং অন্যভাবে বিনষ্ট করেছিলো। অন্যান্য ধ্বংস কাজের সাথে তারা এটাও করেছিলো ইসলামের নামে। ধর্ম এবং ইসলামের নামে তারা কি ধরনের দুস্কৃতকারীর ভূমিকায় নামতে পারে সেটা ছিলো তারই একটি বড়ো দৃষ্টান্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের "গণতান্ত্রিক" সরকার এবং ইসলামের ঝাণ্ডাধারী বি, এন, পি,'র প্রধান মন্ত্রীসহ অন্যান্য নেতারা সে বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেননি। সে ব্যাপারে কোন তদন্ত কাজও বিশেষভাবে করা হয়নি। কোরান পোড়ানের অজুহাত তুলে এ দেশে অনেকবার দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু জামাতে ইসলামী আহমদিয়াদের কেন্দ্র আক্রমণ করে বহু ভাষায় অনুদিত বহুসংখ্যক কোরান পুড়িয়ে নষ্ট করলেও তার বিরুদ্ধে কোন উচ্চবাচ্য জামাতে ইসলামীওয়ালাদের পক্ষ থেকে তো স্বাভাবিকভাবে করাই হয়নি, উপরন্তু সরকার থেকেও জামাতের চিহ্নিত দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধেও কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এটিই হলো কোরান, ইসলাম, ধর্ম ইত্যাদি সম্পর্কে জামাতে ইসলামী এবং তাদের দোসর বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গী। এরা এসবকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। তছাড়া তাদের ধর্ম দিয়ে মাতামাতির অন্য কোন গ্রাহ্য উদ্দেশ্য নেই।

২৪শে ডিসেম্বর বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব কাদিয়ানীদেরকে অমুসলমান ঘোষণার জন্য যে 'মহাসম্মেলন' আহ্বান করেছে সেটা যে এ দেশে সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে রাজনৈতিক ফায়দা ওঠানোরই একটি চক্রান্ত। এই চক্রান্ত প্রতিহত করা আমাদের সকলেরই গণতান্ত্রিক কর্তব্য"।

(২৩-১২-১৯৯৩ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকার সৌজন্য)

দেশটাকে কি ওরা পাকিস্তান ভাবছে?

মাহফুজ সিদ্দিকী

"এটা বাস্তব সত্য যে, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের পতাকা আজ শোভা পাচ্ছে। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ, তিরিশ লাখ শহীদের রক্ত ও দুই লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে এ স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। স্বাধীনতার বাইশ বছর কেটেও গেছে এখনও পর্যন্ত এ দেশের মানুষ যুদ্ধের ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে পারেনি। এই দরিদ্র অবস্থায়ও দেশকে ভালবেসে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য জনগণ ঐকান্তিক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, একশ্রেণীর মানুষ দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। এই অশুভ চক্র কখনও প্রকাশ্যে কখনও অপ্রকাশ্যে, কখনও রাজনৈতিক লেবাস পরে, কখনও ধর্মের নামাবলী গায়ে চড়িয়ে দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের মুলোৎপাটনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

এই অশুভ চক্রের মানুষগুলো অচেনা নয়, চিহ্নিত। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এরা এ দেশের স্বাধীনতায় বিরোধিতা করেছিল। স্বাধীনতার পরও তারা কখনও এ দেশের স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারেনি। স্বীকার করেনি। সময়ে অসময়ে সুযোগ পেলেই মারমুখো হয়ে উঠেছে। এমনকি তারা থেমে না থেকে সংগঠিত হয়ে একের পর এক স্বাধীনতা বিরোধী কার্যকলাপ করে যাচ্ছে। তাদের সাহস এতই বেড়ে গেছে যে, এখন তারা প্রকাশ্যে এ দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে উস্কানি দিচ্ছে, ফতোয়া জারি করছে, পাকিস্তান থেকে 'মাওলানা' এনে সম্মেলন করে এ দেশের বিরুদ্ধে জনগণকে প্ররোচিত করছে।

ঢাকা সেনানিবাসে স্বাধীনতা যুদ্ধে নিহত বীর সৈনিকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত শিখা অনির্বাণে সেনাবাহিনীর শ্রদ্ধা জানানোর বিষয়টি অনৈসলামিক প্রথা বলে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক ফতোয়া জারি করেন। এই শিখা অনির্বাণ সম্পর্কে জামাতের একজন সাংসদও অনুরূপ কটূক্তি করেন। খতিব মহোদয় অবিলম্বে শিখা অনির্বাণ বন্ধেরও দাবি জানিয়েছেন। খতিব মহোদয় মশাল জ্বালিয়ে সাফ গেমস উদ্বোধন করাকেও মুসলমানদের ঈমান-আকিদার পরিপন্থী বলে ফতোয়াবাজি করেন।

শিখা অনির্বাণ হচ্ছে জাতীয় বীরশ্রেষ্ঠদের পবিত্র স্মৃতির বাহক। এই শিখাকে নিভিয়ে ফেলতে বলার পিছনে কি অর্থ এবং উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে এদেশের নর-নারীর তা বুঝতে কষ্ট হয় না। শিখা নিভিয়ে দিয়ে এ দেশকে তারা আবার অন্ধকারে নিমজ্জিত করতে চায়। কিন্তু তারা জানে না, এ দেশে একজন মুক্তিযোদ্ধা বেঁচে থাকতে তা কোনদিনই হবার নয়।

এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্র ধর্মের লেবাস পরে, ধর্মের কথার আবরণে এ দেশের মানুষকে এ দেশেরই বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলার প্রয়াস পাচ্ছে। তারা খতমে নবুওয়তের সম্মেলনে এনেছে একদল পাকিস্তানী মোল্লা। তারা বক্তব্য রেখেছে। এ দেশের মানুষ আজও ভোলেনি উর্দুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা। বাংলাভাষা-মায়ের ভাষা-মুখের ভাষার জন্যে এ দেশের সন্তানেরা যে বুকের তাজা রক্ত ঝরিয়ে ছিল তা আজও অম্লান। আজকের যে স্বাধীনতা তার ভিত্তিই তৈরি করেছিল '৫২-র ভাষা আন্দোলন। যে ভাষা আন্দোলন ভিত গড়ে তুলেছিল উনসত্তরের গণভ্যুত্থানের, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের এবং যে চেতনার ফলে দেশ স্বাধীন

হলো—সেই ভাষার দেশেই আবার চিরশত্রু উর্দু-এর পিছনে যে গভীর দুরভিসন্ধি নিহিত রয়েছে তা জনতার বুঝতে বাকি নেই। ধর্মের নামে কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবির নাম করে প্রকৃতপক্ষে তারা এ দেশকে আবার পাকিস্তানে পরিণত করার প্রয়াস পাচ্ছে।

ওদের কার্যকলাপে মনে হয় ওরা এ দেশটাকে বাংলাদেশ নয়, পাকিস্তান মনে করে। মতিঝিলের শিপিং কর্পোরেশনের বিল্ডিংয়ের পাইওনিয়ার অডিটোরিয়ামে ছিল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর জন্মদিন অনুষ্ঠান। সে অনুষ্ঠানে জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর ভাষণে বলেছেন, কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রকৃতপক্ষে আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু আজ আমরা তাঁর বিরুদ্ধে অপব্যাখ্যা করি। এই অপবাদ এক দিন অপসারিত হবে। ইতিহাস অপব্যাখ্যাকে ক্ষমা করবে না।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি এদেশেরই সন্তান। তিনি পাকিস্তানের জন্ম দেখেছেন এবং মুক্তিযুদ্ধও দেখেছেন। দীর্ঘ নয়মাস যুদ্ধ, তিরিশ লাখ শহীদ এবং দুই লাখ মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠনের কথা নিশ্চয়ই তাঁর অজানা নয়। তিনি নিশ্চয়ই জানেন কত কষ্ট-ত্যাগ ও সাধনার পর এ দেশ স্বাধীন হয়েছে। তারপর তাঁর মতো শিক্ষিত বর্ষীয়ান ব্যক্তির মুখে এ ধরনের উক্তি সবাইকে স্তম্ভিত করেছে। এ ধরনের উক্তিতে এটাই কি তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে মুক্তিযুদ্ধ করে এ দেশ স্বাধীন হয়নি, এ দেশ স্বাধীন করে দিয়েছেন জিন্না সাহেব। আজরফ সাহেব কথাগুলো বলেছেন ডিসেম্বর মাসে। যে ডিসেম্বর মাস বাঙালী জাতির কাছে একটি অত্যন্ত পবিত্র মাস। কেননা এ মাসের ১৬ তারিখে বিজয় সূচিত হয়। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান হয়। দেশ হয় হানাদার মুক্ত। এমন একটি পবিত্র মাসে জিন্নাহ্ সাহেবের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করা হলো এবং জন্মবার্ষিকী পালনের মোড়কে আজরফ সাহেব এ দেশেরই বিরুদ্ধে কথা বললেন। এসব কিছুকে কি জাতি সহজে মেনে নেবে? মেনে নিতে পারে না। কারণ এই ধরনের বক্তব্য উদ্দেশ্যবিহীন নয়। বরং সুপরিকল্পিত কর্মকাণ্ডেরই বহিঃপ্রকাশ। দেশটাকে নিয়ে যে সুপরিকল্পিত রাজনীতি চলছে এবং দেশের স্বাধীনতা ধ্বংসের যে পাঁয়তারা চলছে তার নজির সাফ গেমসেও অল্প-বিস্তর পাওয়া গেছে। সেখানে জাতীয় পতাকার হয়েছে লজ্জাকর অবমাননা। সাফ গেমসের কয়েকটি ভেন্যুতে বাংলাদেশের যে জাতীয় পতাকা ওড়ে তাতে সাদা রঙের কিছু অংশ সংযুক্ত হতে দেখা যায়। সাফ গেমসের মতো আন্তর্জাতিক গেমসে জাতীয় পতাকায় এ ধরণের ভুল-এটা কি অনিচ্ছাকৃত? না-কি 'পাকিস্তানী করণের প্রক্রিয়া'?

পতাকার রূপ যাতে কোন অবস্থা পরিবর্তিত না হয়, বিকৃত না হয় তার জন্যে রয়েছে সুস্পষ্ট মাপ, নির্দিষ্ট রং এবং সাইজ। তা সত্বেও সাফ গেমেসর মতো আন্তর্জাতিক একটি অনুষ্ঠানে নিজ দেশের পতাকাকে বিকৃত করা হয়েছে। আমাদের পতাকায় আমরা জানি লাল ও সবুজ রং ছাড়া আর কোন রং নেই। অথচ ওরা পতাকায় সাদা বর্ডার জুড়ে দিয়েছে। জাতীয় পতাকার এ বিকৃতি কখনও ভুল হতে পারে না। নিশ্চয় এ কাজ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের দোসরদের দ্বারাই হয়েছে। এ কাজ ইচ্ছাকৃত—এ দেশকে যারা আজও ভালবাসতে পারেনি নিশ্চয়ই তাদেরই কাজ। তারা চায়, যে কোনভাবেই হোক এদেশকে খর্ব করা, এ দেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করা—এ দেশকে আবার পাকিস্তানে

পরিণত করা। কিন্তু সেটি হবার নয়। এ দেশের জাগ্রত জনতা মরতে শিখেছে। দেশের জন্যে প্রাণ দিতে শিখেছে। যারা এ ধরনের কাজ করে উদ্দেশ্য হাসিলে প্রয়াসী তারা বোকার স্বর্গে বসবাস করছে।

শুধু জাতীয় পতাকা বিকৃত করাই নয়, জাতীয় সঙ্গীত নিয়েও পাকিস্তানী দোসরদের ঘৃণ্য কারসাজির প্রমাণ পাওয়া গেছে। "সাফ গেমসের দায়িত্বপ্রাপ্তরা জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি অবহেলা দেখালেন। বিভিন্ন ভেন্যুতে বাংলাদেশের ক্রীড়াবিদরা তাঁদের সেরা নৈপুণ্য দেখিয়ে দেশের জন্যে সোনা জেতার পর যখন তাঁরা পদক নিতে বিজয়স্তম্ভে দাঁড়ান তখন বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের সুর মাত্র দু'লাইন বাজানো হয়। অথচ পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীতের সময় তা অনেকক্ষণ ধরে বাজানো হয়। কর্মকর্তাদের এ ধরনের মানসিকতায় বিভিন্ন ভেন্যুতে উপস্থিত দর্শকরা ক্ষুব্ধ হয়।" —জনকণ্ঠ।

জাতীয় পতাকা বিকৃতি ও অবমাননা এবং জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি অবজ্ঞা এসব কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এসব এ দেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানপ্রেমীদের সুগভীর ষড়যন্ত্রেরই বহিঃ প্রকাশঃ আর এসব হচ্ছে চিহ্নিত শত্রুদের দ্বারাই। পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রতিক্রিয়াশীল চক্র সুযোগ বুঝে কোন না কোনভাবে এ দেশের ক্ষতিসাধনে লিপ্ত। গত ২৪ ডিসেম্বরের বরিশালের এক জনসভায় জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান বলেন, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পর ১৫/২০ দিন এই দেশে ভারতীয় শাসন ছিল। এর আগে এই আব্বাস আলী খানই বলেছিলেন যে, আওয়ামী লীগের লোকেরাই বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে।

জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও জামায়াতে ইসলামীর একজন সাংসদ এবং বায়তুল মোকাররমের খতিব ওবায়দুল হক, জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ প্রমুখ এবং তাদের দোসররা যে সব উক্তি করেছেন এবং সাফ গেমসে জাতীয় জাতীয় পতাকার বিকৃতি ও জাতীয় সঙ্গীতকে নিয়ে টালবাহনা এসব কিছুরই উদ্দেশ্যে এক ও অভিন্ন—তারা এ দেশকে মেনে নিতে পারছেন না, তারা আজও পাকিস্তান প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন এবং এ দেশকে আবার পাকিস্তানে পরিণত করার দিবাস্বপ্ন দেখছেন।

আমাদের প্রশ্ন, কিভাবে এসব ঘটনা কিভাবে এই ধরনের বিবৃতি প্রকাশ পাচ্ছে? দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার রয়েছে। সরকারী প্রশাসন কর্মকর্তাদের নাকের ডগার ওপর এসব ঘটনা ঘটছে কি করে? তবে কি আমরা ধরে নেবো সরকার এসব দেখেও দেখছে না, শুনেও শুনছে না? যদি তাই হয় তাহলেও ফল ভাল হবে না। কেননা এ দেশের জাগ্রত জনতা কখনই এ দেশের শত্রুদেরকে ক্ষমা করবে না। এ দেশের মানুষ শেষ রক্তবিন্দু দেবে তবু এ দেশকে আর পাকিস্তান হতে দেবে না।"

(২৮-১২-৯৩ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

অধিকারের সীমানা

হায়াৎ মামুদ

"অতি সম্প্রতি যুদ্ধের ময়দানে ধর্মকে পাঠাবার জন্যে এদেশের ইসলামী মৌলবাদীরা প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। যাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ তাঁরা পরিচালনা করতে চান তাঁরাও মুসলমান, কিন্তু ভিন্ন পথের পথিক, ভিন্ন মতের মতাদর্শী- তাঁরা কাদিয়ানী বা আহমদিয়া সম্প্রদায়। মওদুদীর মতের অনুসারী জামাতে ইসলামীরা বলছেন যে, কাদিয়ানীরা মুসলমান নন। এ কথা তাঁরা বলতেই পারেন, যেহেতু দেশে গণতন্ত্র ও বাকস্বাধীনতা থাকলে যার যা ইচ্ছা তিনি তাই বলতে পারেন। কিন্তু তাঁরা যখন দাবি তোলেন যে, দেশের গণতান্ত্রিক সরকারও তাঁদের সুরে সুর মেলাবে এবং তাঁদের আনন্দ বিধানের জন্য এই মর্মে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবে যে কাদিয়ানীরা অমুসলিম, তখন অযৌক্তিক দাবি আবদারের পর্যায়ে চলে যায় না কি? আমি ধর্মতত্ত্বজ্ঞ নই। হতে পারে কাদিয়ানীরা মুসলমান নন। এটাও হতে পারে, জামাতে ইসলামীরাও মুসলমান নন। এমনকি হতে পারে না যে উভয় পক্ষই অমুসলমান, কিন্তু উভয়েই দাবি করছেন মুসলমান বলে এবং ঝগড়াটা সেজন্যই? আবার এমনও কি হতে পারে না যে উভয়েই মুসলমান, কিন্তু কাদিয়ানীদের মুসলমানত্ব খারিজ করে দিতে পারলে পরলোকের চেয়ে ইহলোকের কিছু স্বার্থ সিদ্ধ হয়? আসল ঘটনা কী, আমি আলেম নই বলে জানি না। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা জানিয়ে দিচ্ছে যে ইসলামের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানিক রূপ উভয় সম্প্রদায়ই একইভাবে পালন করেন। বিশ্বাসীর ধর্মপালনের যে অঙ্গীকার এবং যে যে পদ্ধতি ইসলামে অবশ্য করণীয় হিসেবে মুমিনের কাছ থেকে দাবি করা হয়েছে— কলেমা নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত-উভয় সম্প্রদায়ই তা পালন করে যাচ্ছেন। তাই আমার মতো সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষজনের কাছে জামাতীরা যেমন মুসলমান, আহমদিয়ারাও তেমনি মুসলমান, আমি তো তর-তম ভেদ কিছুই দেখি না, সে জায়গায় 'খারাপ মুসলমান' ও নয়, একেবারে অমুসলমান'? মুসলমান-অমুসলমান বিচার করার বিচারক আমি নই, তা বুঝি। কিন্তু এওতো বুঝতে পারছি যে, পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া কাদিয়ানীরা বাধান নি, বাধাচ্ছেন জামাতীরা। এক্ষেত্রে কাদিয়ানীদের সামাজিক সামষ্টিক ব্যবহার নিঃসন্দেহে সংযত, সভ্য, রুচিশীল, সহিষ্ণু ও গণতান্ত্রিক। কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের সামাজিক ব্যবহারে পেশীশক্তির আস্ফালন ও প্রয়োগ কেউ দেখেছেন বলে জানি না।

কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে জামাতীদের দেখবার আগে আমার কিছু ব্যাপার জানতে ইচ্ছে করে। আমি নিতান্ত সাধারণ মাপের, সাধারণ বুদ্ধির ও অগভীর চিন্তাশক্তির মানুষ।

তাই আমার জিজ্ঞাসাও নিতান্ত ছোট্ট। প্রশ্নটি এই কাদিয়ানীরা যে অমুসলমান একথা জামাতীরা হঠাৎ কী করে জানতে পারলেন? আমি যা বুঝতে চাইছি এবং সে জন্যই প্রশ্ন, তা হল: কাদিয়ানীরা তো নিজেদের মুসলমানই বলে আসছেন বরাবর এবং ইসলামের বরখেলাপ কোনো কাজকর্মও তো করেন না—তাহলে সেই বিশেষ চিহ্নটি কোথায় কাদিয়ানীদের পোশাকআশাকে কাজকর্মে সেঁটে দেওয়া আছে যা দেখে জামাতীরা জানতে পেরেছেন যে, এঁরা মুসলমান নন? ধরে নিচ্ছি, মুসলমান না হয়েও এঁরা নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। তো, জামাতীদের এতে কী ক্ষতি হল? কাদিয়ানীরা কি আহ্লাদে গলা জড়িয়ে ধরতে আসছে যে, দূরে ঠেলে দেওয়ার জন্য? চেঁচামেচি করে জানাতে হবে- ও আমার কেউ নয়। যে যার মতো থাকলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। তার চেয়েও বড় কথা-কাদিয়ানীরা মুসলমান কি অমুসলমান এই বিচারের ভার কবে থেকে জামাতীদের ওপরে ন্যস্ত হয়েছে? কাদিয়ানীরা নিজে কি আত্মপরিচয়ের সংকটে ভুগছেন যে পথনির্দেশের সুমহান দায়িত্ব জামাতে ইসলামীদের স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নিতে হয়েছে? ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারটিতো ইহজাগতিক নয়, সম্পূর্ণত পারলৌকিক। অমুসলমান হয়েও মুসলমানের ভান করায় শাস্তি যদি পেতেই হয় তো সে শাস্তি দেয়ার ভার তো স্রষ্টার হাতে। জামাতে ইসলামী কি তবে এ দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্ব পেয়েছে? কবে থেকে এবং তার প্রমাণ? ধর্মপ্রাণ মুসলমান হিসেবে এ দুঃসাহস তাদের হয় কী করে? এবং যারা নিজেদের আল্লাহর বান্দা ও মুসলমান বলে স্বীকার করেন তাদের অমুসলমান বলার অধিকার জামাতীদের দিল কে? কাদিয়ানীরা যদি অমুসলিম হয়, তাহলে আগাখানীরা কী? তবে আগাখান-পন্থীদের বিরুদ্ধে জামাতে ইসলামী জেহাদ ঘোষণা করছে না কেন? এ সব ব্যাপার আমি সত্যিই বুঝতে চাইছি। আমি জানি, এ দেশে কোনো মৌলবাদী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী আমার প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতে পারবেন না। তারা বোঝাতে চাইবেন কেন তারা কাদি-য়ানীদের অমুসলিম মনে করেন। হয়তো তারা ধর্মীয় তত্ত্বকথা টেনে আনবেন, সূত্র ব্যাখ্যা করবেন, যুক্তি পরম্পরা সাজিয়ে সিদ্ধান্তে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি ব্যক্ত করবেন। তার মানে দাঁড়াচ্ছে—তারা ইসলামের কোনো স্পষ্ট সিদ্ধান্তকে কর্মে প্রয়োগ করছেন না, তাঁরা ধর্মকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে নিজেরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। তেমন হলে ব্যাপারটির ক্ষেত্রেই (Premise) পাল্টে গেল। ঘটনাটি আর অন্ধ বিশ্বাস অবিশ্বাসে সীমাবদ্ধ থাকল না, ইসলামী ধর্মশাস্ত্রের শাস্ত্রীয় আলোচনার চৌহদ্দিতে চলে এল। কই জামাতীরাতো সে-ধরনের কোনো আলো-চনা তথা ধর্মসভার কথা বলছেন না।

আমি বুঝতে পারি কেন তাঁরা বলছে না। বলছেন না এ কারণে যে তাতে তাঁদের কোন লাভ নেই, ক্ষতি ছাড়া। প্রথমত, সব ধর্মের মতো ইসলামেও বহু মত বহু পথ আছে এবং সে

মত ও পথের দার্শনিক ভিত্তিও আছে। আলোচনা হলেই যৌক্তিক সিদ্ধান্তে না-এসে উপায় থাকবে না যে, আহমদীরাও একটি মুসলমান সম্প্রদায় যেমন শিয়ারা এক সম্প্রদায় সুন্নীরা আরেক সম্প্রদায় ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ ধর্মশাস্ত্রের সূক্ষ্ম কূটকচালে লড়াই যদ্দিন মীমাংসায় না পৌঁছুবে তদ্দিন কোনো কিছু করা যাবে না-আদালতে মামলা চলাকালীন যে অসহায় অবস্থা বাদী-বিবাদী উভয় পক্ষেরই হয়ে থাকে ঠিক তেমনই।

জামাতে ইসলামীর হাতে তারা ভাবছেন, অত সময় নেই। প্রশ্নতো ধর্মের নয় ধর্মবুদ্ধিরও নয়। না, কোনো কিছু বুঝতে তাঁরা চান না; বোঝার জন্য যে নৈতিক নিষ্ঠা তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ আধ্যাত্মিক সততা পরমতসহিষ্ণুতা ও খোলা মন দরকার তা তাঁরা নির্বাসনে পাঠিয়েছেন বহুকাল হল। তাঁরা এখন পেশীশক্তিতে বিশ্বাসী। কিন্তু পেশীর ব্যবহারে পশ্বাচারের গণ্ডিতে পড়ে না কি? সভ্য মানুষের শক্তিতো পেশীতে নয় মেধায় ও মননচর্চায়। আহমদিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁদের মনোভাব স্রেফ দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার সংখ্যা-লঘুর প্রতি সংখ্যাগুরুর অত্যাচার প্রকাশ করে। এ মনোভাবকে আর যাই হোক ধর্মবুদ্ধি বলা যাবে না। কাদিয়ানীদের অমুসলমান ঘোষণা করার কোন পুণ্যফল অর্জিত হবে, যা আদৌ হবে কি না, তা নিয়ে জামাতীদের কোনো শিরঃপীড়া নাই। পরলোকে যা ঘটবার তা না হয় ঘটবে, সে খবর কারো জানার কথা নয় কিন্তু ইহলোকে অন্ততঃ অনেক কিছু ঘটুক। ধর্ম অন্য জগতের ব্যাপার, অতএব অপেক্ষা করা সইবে। রাজনীতি এ দুনিয়ার ব্যাপার, অঙ্কের মাপে দাবার চাল দিতে হবে সেখানে সময়ের দাম অত্যন্ত। কাদিয়ানীরা অমুসলমান হওয়ার অর্থ তারা অমুসলিম সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। আজ কাদিয়ানী তো কাল শিয়া কাল শিয়া তো পরশু—ইসলামের লৌকিক সাধনমার্গও এদেশে বহু পুরানো এবং তাদের সংখ্যাও একাধিক। তাঁরা চাইছেন-আমাদের জাতিসত্তার ভিতরে সম্ভাব্য সকল রকম নিজেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠবেন। নিজেরা মানে ধর্মোনন্মাদরা। তাঁরা যা চাইছেন তা ঘটবে কিনা তা একমাত্র ভবিষ্যতই বলবে।

কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় জামাতে ইসলামীসহ এদেশের মৌলবাদী লোকজন তা ঘটাইতে চাইছেন তাতে ধর্মের আড়ালে সমস্ত রকমের অধর্ম জড়ো করা হচ্ছে। অধর্ম নীতি-জ্ঞানহীনতায়, অধর্ম মিথ্যা প্রচারণায়, অধর্ম অসহিষ্ণুতায়, অধর্ম বিবেকহীনতায়, অধর্ম রাজনৈতিক নৃশংসতায়, অধর্ম ধর্মের নোংরা অপব্যবহারে। ধীরে ধীরে সব সঞ্চিত হয়ে গৃহ বিপ্লবের যে অগ্ন্যুৎপাত ঘটাবে তার লাভাস্রোত থেকে মৌলবাদীরাও রেহাই পাবে না"।

(২০শে জানুয়ারী '৯৪ তারিখের বাংলাবাজার পত্রিকার সৌজন্যে)

দেশ ও জাতি গঠনে সিনেমা-টিভিকে কাজে লাগাতে হবে

—এম এইচ রহমান, পুটিয়া, রাজশাহী।

"মহান আল্লাহ মানুষকে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। মানুষ দুনিয়ার বুকে মহান আল্লাহর খেলাফত কায়েম করবে। দুনিয়াটা আল্লাহর। এখানে একমাত্র মহান আল্লাহরই রাজত্ব কায়েম থাকবে, এটাই আল্লাহ চান। দুনিয়ার জীবনে বেঁচে থাকতে হলে মানুষকে সমাজে বসবাস করতে হয়। দেশের কলা-কানুন বাদ দিয়ে সে চলতে পারে না। এ জন্য আল্লাহ চান সবক্ষেত্রে আল্লাহরই নিয়ম-নীতি চালু হয়ে যাক। মানুষ তার খেলাফতী জিন্দেগীতে রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক আইন আদালতের মত গুরুত্বপূর্ণ দিক ও বিভাগগুলোতে তার ভূমিকা মুখ্য হোক। পক্ষান্তরে শয়তান সবসময় চায় মানুষ আল্লাহর খেলাফতের দায়িত্ব এড়িয়ে চলুক। এই জন্য শয়তানের গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হলো ঐসব গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলোতে শয়তান চরিত্রের লোক নিয়োগ করা। শয়তান চায় ঐ পদগুলো দুশ্চরিত্রের লোকেরা দখল করুক। সারা দুনিয়ায় আল্লাহ্র খেলাফতের পরিবর্তে শয়তানের খেলাফত কায়েম হোক। এজন্য শয়তানের অনুসারীরা আদা-পানি খেয়ে মাঠে নেমেছে। সেই অনুপাতে দ্বীন-ইসলামী সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও দলের তৎপরতা নিতান্তই কম বলা যায়।

দ্বীন ইসলামের যতটুকু কাজ হচ্ছে, এটুকুরও মোকাবিলা করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা-বাদ, সাম্রাজ্যবাদ, ইহুদীবাদ, ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভৃতি অপশক্তিগুলো চরম ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঐ সকল অশুভ শক্তির ইঙ্গিতে তাদের সেবাদাসেরা সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, নাটক, গান প্রভৃতিকে ইসলামের মোকাবিলায় ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে। অতি সম্প্রতি এক নেত্রী একটি শিল্পগোষ্ঠীকে মৌলবাদের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। গত কিছুদিনে এমন কয়টি নাটক টিভিতে প্রদর্শিত হয়েছে যেগুলোর ভিতর দিয়ে চিত্ত-বিনোদনের চাইতে জাতির মধ্যে তিক্ততা, হিংসা-দ্বেষ এবং চরম অনৈক্য সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে। আজ জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোর এই অবস্থা। দেশের শত শত সিনেমা হল-গুলোতে কি হয় তা চিন্তার বিষয়। অশ্লীল গান-বাজনা ঈমান নষ্টের জন্য বিরাট এক হাতিয়ার। আজকাল সিনেমা হলগুলোতে যেসব অশ্লীল ছবি দেখানো হয় তাতে ঈমান নষ্ট হয়। চরিত্র গঠন হয় না বরং চরিত্র ধ্বংস হয়। যারা সিনেমা হলগুলোতে যায় তারা অধিকাংশই তরুণ-যুবক। তারা জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ষ্টেজে দাঁড়িয়ে। শিশুরা বুঝে না কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ। আর বৃদ্ধরা জীব সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে দিন গুণছে কখন না জানি মালিকুল মওত এসে জীবনটা কেড়ে নিয়ে যায়। তাই আল্লাহ-রসূলের নাম বেশী বেশী নেয়। মনে না চাইলেও পরপারের সাড়া দেয়। তাদের জীবনে আমোদ-আহলাদ আর ভাল লাগে না। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে তাদের মন যেতে চায় না। জীবনে কিছু করার

থাকলে তা হলো যৌবনকালে। এই সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। খরস্রোতা নদীতে বর্ষার ভরা যৌবনে হাওয়ার একটু দোলা পেলে নদী যেমন উতাল পাতাল করে, তেমন। নদী যেমন একূল ভাঙ্গে ওকূল গড়ে, হাজার হাজার ঘর-বাড়ী জাগা-জমি তছনছ করে মানুষের যৌবনকাল ঠিক তাই। আর তাই যৌবনের এই মূল্যবান সময়ে চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ না পেলে তাদের ভালোর চাইতে মন্দই হবে বেশী।

ছায়াছবির পর্দায় অশ্লীল, বেহায়াপনা যুবক-যুবতীর অবাধ প্রেমলীলা, হাসি-রঙ-তামাসা ছোরা-বল্লম, লাঠি-সোটার ব্যবহার সহ আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের কলা-কৌশলও দেখানো হয়। দর্শকেরা সেগুলো মনে মনে আত্মস্থ করে। ঘটনা প্রবাহে শিক্ষণীয় কিছু থাকলে জাহেলী শিল্পীর অপকৌশলের কারণে সেগুলো ঢাকা পড়ে যায়। যুব চরিত্র গড়ার চাইতে নষ্ট হয় বেশী। এর হিসাব গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে একজন সচেতন মানুষের হৃদয় ব্যথিত না হয়ে পারে না।

বাংলাদেশে ৪৬৪টি থানা। জেলা শহরগুলোসহ গড়ে দু'টো করে সিনেমা হল। হলের সংখ্যা প্রায় ৯২৮টি। প্রতিটি হলে প্রায় ৮০০ হতে ১৫০০ সিট আছে। এতে গড় সিট সংখ্যা প্রায় ১১৫০টি। প্রায় দিন ৪শ' ছবি দেখানো হয়ে থাকে। এই হিসেবে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৪৪ হতে ৪৫ লাখের বেশী তরুণ শুধু সিনেমা হলগুলোতে ছবি দেখে। টিভি এবং ভিসিআর-এর পরিসংখ্যান যোগ দিলে এই সংখ্যা আরো অনেক বেশী হবে।

রেডিও, টিভি, ভিসিআর, সিনেমাগুলো আল্লাহর এক একটি নেয়ামত। এগুলোকে যুব চরিত্র গঠনের কাজে ব্যবহার করলে দেশ ও জাতির মঙ্গল হতো। কিন্তু সরকারের ছত্রছায়ায় এক শ্রেণীর রাজনীতিকের ইঙ্গিতে যুব চরিত্র ধ্বংস করার কাজে এসব ব্যবহার করা হচ্ছে। শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশ বাংলাদেশ। সুতরাং দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে টিভি ও সিনেমা হলগুলোতে মুসলমান বানানোই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। যুব চরিত্র ধ্বংসকারী ছবি পরিহার করে আল্লাহর খেলাফত কায়েমের উপযোগী চরিত্র গঠন হয়, এমন ছবি টিভি সিনেমা হলগুলোতে পরিবেশন করাই একান্ত উচিত। আর এজন্য সরকারসহ ধর্মপ্রাণ ও দেশপ্রেমিক প্রতিটি মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে"।

(২৭-১-৯৪ তারিখের দৈনিক সংগ্রামের সৌজন্যে)

আহমদীয়া মুসলিম জামাত ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে সমগ্র জগতে ইসলাম প্রচার করছে।

—আহমদী

একটি চিঠি

ক্লান্ত পথিককে ধন্যবাদ ও কিছু তথ্য

"জনপ্রিয় জনকণ্ঠের 'বিরস কাহিনী'তে ক্লান্ত পথিকের 'লাপাত্তা ভগবান' ও 'চিনিহীন চিনিওটি' পড়লাম। ধন্যবাদ লেখককে। লেখকের কাছে আমাদের দাবি আপনি অক্লান্তভাবে লিখে যান দেশের পক্ষে, দশের পক্ষে। আপনি দয়া করে ক্লান্ত হবেন না।

ভারত থেকে আগত ঐ 'ভগবান'-এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিল, আলাপ হয়েছিল কয়েকবার। তার মুসলমানী নাম ছিল ইসলামুল হক। তার দাবি ছিল মহানবী (সাঃ) নাকি তাকে স্বপ্নে মুসলমান বানিয়ে ছিলেন এবং ভারতে ইসলাম প্রচারের জন্য আদেশ দিয়েছিলেন। স্বপ্নে নাকি বলা হয়েছিল যে, বারো বছরের মধ্যে ভারতে ইসলাম জয়যুক্ত হবে, খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। আমি প্রশ্ন করেছিলাম, "ভারতে ইসলাম প্রচার করার আদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর আপনি ভারত ছেড়ে বাংলাদেশে এলেন কেন?" এর কোন উত্তর পাইনি। যাইহোক সরকার তাকে মালয়েশিয়া পাঠিয়ে দেন। এরপর চলে যান ভারতে। সেখানেই আছেন তিনি। ওষুধের ব্যবসা করেন। বড় জামাত তার পৈত্রিক আশ্রয়টি পরিচালনা করেন। এক কথায় ঐ 'ভগবান' এখন হারিয়ে গেছেন। মঞ্জুর আহমদ চিনিওটি সম্বন্ধে কয়েকটি পাকিস্তানী পত্রিকার খবর হলো, 'এই ব্যক্তি খতমে নবুওতের নামে জাতির কাছ থেকে চাঁদা আদায় করছে'। (দৈনিক হায়দার, রাওয়ালপিণ্ডি, ১ নবেম্বর ১৯৮৮) মঞ্জুর চিনিওটি নিজ এলাকায় ধর্মীয় এবং সাম্প্রদায়িক হিংসার বিষ তৈরি করে পরিবেশকে দূষিত করছে (দৈনিক মসাওয়াত, ২৩শে ডিসেম্বর ১৯৮৮)। উল্লেখ্য, তার নামের সঙ্গে চিনিওটি যুক্ত থাকলেও চিনিওটবাসী কিন্তু তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে (দৈনিক ইমরুজ, ৭ জুলাই ১৯৮৯)।

নিজ দেশে অবাঞ্ছিত ঘোষিত হওয়ার পর মঞ্জুর চিনিওটি এখন খতমে নবুওতের আলখেল্লা পরে বাংলাদেশের বাজারকে গরম করছে। এ ব্যাপারে সরকার সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করে চলেছেন দেখে আমার মতো বাঙালীরা যারা ১৯৭১ সালে পাকিস্তানীদের এবং তাদের সঙ্গী মৌলবাদীদের কার্যকলাপ স্বচক্ষে দর্শন করেছে তাদের প্রশ্ন—বাংলাদেশকে পুনরায় পাকিস্তানে পরিণত করা হবে? এ ব্যাপারে আমরা সরকারের কাছে স্পষ্ট জবাব চাই।" (আলহাজ কমর রব্বি গোলাম হায়দার, মজলিস আসহাবে কাহাফ, ৭২ বীর, সুনামগঞ্জ)

(জনকণ্ঠ—২৯/১/৯৪-এর সৌজন্যে)

আপনার চিঠি পেলাম ঃ

১১-১০-৯৪

জনাব,

সর্বপ্রথম আমার সালাম গ্রহণ করিবেন। আশা করি খোদার রহমতে ভালো আছেন। আমি ভাল আছি। যাক্ আপনাদের দেয়া বই আমার নিকট হস্তগত হয়েছে ও সেগুলো পেয়ে খুব খুশী হয়েছি। জনাব, আপনাদের নিকট আগের পত্রটির মধ্যে খুব খারাপ গালাগালি এবং হুমকি দিয়েছি সেই জন্য আন্তরিকভাবে লজ্জিত এবং দুঃখিত। আশা করি সুন্দর দৃষ্টিতে ক্ষমা করিবেন। যাক্, জনাব, যদি সম্ভব হয় তা হলে আরও কিছু বই পাঠিয়ে উপকৃত করবেন এবং সম্ভব হলে আপনাদের মাসিক পত্রিকা "আহম্মদীয়া" পাঠাবেন। আমি আপনাদের প্রকাশনার কোরান শরীফের তরজমা এবং হাদীস শরীফ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। সেগুলো কিভাবে, কোথায় পাওয়া যায় তা জানাবেন। জনাব, আসলে কাউর সম্বন্ধে কিছু না জেনে, শুনে কোন কথা বা কোন কাজ করা উচিত নয়। জনাব, যদি সম্ভব হয় পরবর্তীতে আপনাদের নিম্নলিখিত বই পাঠাবেন।

১। আঞ্জামে আথম
২। আনওয়ারে খেলাফত
৩। ছাদাকাত
৪। কালেমাতুল ফছল
৫। ইশতেহারে মিয়ারুল আখইয়ার
৬। আরবাইন
৭। আল ফজলে কাদিয়ান
৮। বরকাতে খেলাফত
৯। মালায়েকাতুল্লাহ্

যাক্, জনাব, পরবর্তীতে আর এমন হবে না। আমি আবারও আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি আমার পূর্বের চিঠির জন্য। আজ এই পর্যন্ত। পরবর্তীতে আবার লেখা হবে।

নিবেদক—
মোঃ আবু তাহের (হাসান)
৬০, পশ্চিম দেওভোগ
নারায়ণগঞ্জ জেলা,
বাংলাদেশ।

বিঃ দ্রঃ—জনাব, আপনারা আমাকে বইগুলো দিয়ে যে এত উপকৃত করবেন তা আমি জানতাম না। যাক্ পরিশেষে আপনাদের খোদা সহায় হউন। আপনাদের নিকট

উল্লেখিত বইয়ের নামগুলো আপনাদের প্রকাশিত "আহম্মদিয়া" পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছি। আশা করি এই বইগুলো পাঠিয়ে আমাকে উপকৃত করিবেন।

প্রিয় ভাই জনাব মোহাম্মদ আবু তাহের (হাসান),

আপানার ১১/১ তারিখের পত্র পেয়ে খুবই খুশী হয়েছি। সর্ব করুণাময় আল্লাহ্ই ক্ষমার মালিক। তিনি ক্ষমায় কখনও কার্পণ্য করেন না। আপনার বেলাও তাই হউক। তার দরবারে এই আকুতি জানাচ্ছি। আমি আপনাকে ভাই হিসেবে গ্রহণ করছি। এ বন্ধন দৃঢ় হউক এই কামনা করছি। আমরাতো (আপনি ও আমি) ঐ নবীর উম্মত বলে দাবি করি যিনি তাঁর পথে যে মহিলা কাঁটা বিছাতো তার রোগ শয্যায় সেবা করেছেন। যে বুড়ী সদা তাঁকে গালিগালাজ করতো তার বোঝা বইছিলেন। চলুন আমরা তাঁর এসব অনুপম উদাহরণের অনুসরণ করি। তবে জীবন ও সমাজ সুন্দর হবে, সুমহান হবে, সার্থক হবে। আরো কিছু বই বুলেটিন পাঠানো হচ্ছে। যে-সব বই চেয়েছেন সেগুলো ষ্টকে নেই। পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। আপনি আমাদের নারায়ণগঞ্জ শাখার সাথে যোগাযোগ করলে সুবিধা হবে। এর ঠিকানা দিলাম। পাক্ষিক আহমদী পত্রিকা পাঠানো হবে।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
২২/১/৯৪

দোয়া করি দোয়া চাই।
দোয়ার তুল্য কিছ নাই।।

কালামুল ইমাম

দোয়া তৃণখণ্ডকে কড়ি কাঠের শক্তি দান করতে পারে

"দোয়া এরূপ এক শক্তি যা তৃণখণ্ডকে কড়ি কাঠের শক্তি দান করতে পারে আর দোয়ার মাধ্যমেই বিন্দু সিন্ধুতে পরিণত হয়। আপনার উপদেশের বিন্দু বিফলে যাবে এবং আশে পাশের পিপাসার্ত ভূমি উহাকে আত্মস্থ করে উহার চিহ্নও অবশিষ্ট রাখবে না। হ্যাঁ, যদি দোয়ার সৌভাগ্য উহার লাভ হয় তাহলে অবশ্যই উহা সিন্ধুতে পরিণত হবে। সমগ্র বিশ্বের পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্যে যোগ্যতা অর্জন করুন। অতএব দোয়ার মাধ্যমে স্বীয় জন্মভূমিরও সেবা করুন। যালেমদের হাতকে নিবৃত্ত করে মযলুমকে সাহায্য করুন এবং উপদেশ দিতে থাকুন যেন জগতে সত্যতা সমুন্নত হয় আর পরিশেষে মানুষের বোধোদয় হয়।"

[হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)]

بسم الله الرحمن الرحيم

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৭০তম সালানা জলসা

৪, ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪

ন্যাশনাল আমীর সাহেবের উদ্বোধনী ভাষণ

আশহাদু-আনলা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু, আম্মাবা'দু ফাআউযুবিল্লাহে মিনাশ শাইত্বানির রাজীম।

বিসমিল্লাহির রাহ্মানীর রাহীম

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন, আর্ রাহমানির রাহীম, মালেকে ইয়াউমিদ্দীন ইয়্যা কানা'বুদু ওয়া ইয়া কানাস্তাঈন, ইহ্দিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম, সিরাতাল্লাযীনা আন্ আমতা আলায়হিম, গায়রিল মাগদুবে আলায়হিম ওয়ালাদ্দোয়াল্লীন। (আমীন)।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আস্সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু। আল্লাহর অসীম করুণায় আমরা সালানা জলসায় মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করায় তাঁরই দরবারে হাজারো শুকরিয়া আদায় করছি। আগত সবাইকে স্বাগতম এবং বাংলাদেশের সব ভাই-বোনদের বিশেষ করে আহমদী জামাতের সদস্য-সদস্যাগণের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। খুবই আনন্দ বোধ করছি যে, এবারের সালানা জলসায় অনেক নতুন মুখ দেখতে পাচ্ছি। আল্লাহ্ আমাদের সবার সহায় হউন, সাথী হউন দরদে দিলে এই কামনা করছি।

১৯৯৩ সাল ঃ

সময় বসে থাকে না। এর অবিরাম গতি কেউ থামিয়ে দিতে পারে না। আমাদের জীবনে সময়ের গুরুত্বের অনেক তারতম্য হয়। সামাজিক জীব বিধায় অবশ্যই এই তারতম্য কিছুটা যেমন আমাদের নিজেদের ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ ও কর্ম প্রচেষ্টার উপরে নির্ভর করে তেমনি নির্ভর করে অপরের উপরেও এবং সর্বোপরি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র উপরে।

১৯৯৩ সাল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ও বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জন্য একটি ঘটনা বহুল বৎসর। সময়ের স্বল্পতার দিকে লক্ষ্য রেখে শুধু ঐসব ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে যেগুলো আমাদেরকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছেঃ (১) সেটেলাইট ও ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাপী ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষার প্রচার (২) সম্মেলন মহাসম্মেলনের জোয়ার (৩) আন্তর্জাতিক বয়াত দিবস পালন (৪) স্থবিরতার অবসান (৫) তবলীগ, তালীম, তরবীয়ত ও সাংগঠনিক সমস্যা (৬) রাবেতার কাজের সীমাবদ্ধতা (৭) পত্র-পত্রিকাদির সাড়া।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ও ডিশ এন্টেনা ঃ

বিগত সালকে বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জন্য 'ডিশ এন্টেনা বছর' বল্লে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। যেদিন আমাদের ৬৯তম সালানা জলসা শেষ হয় অর্থাৎ ১২ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯৩) বাংলাদেশের অধিবাসীদের জন্য প্রকৃত ইসলামকে জানবার, বুঝবার ও উপলব্ধির এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। সে দিন আমরা ঢাকাতে ডিশ এন্টেনার মারফত আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনস্থ মসজিদ ফযলে প্রদত্ত জুমুআর খুতবা সরাসরি শুনতে ও দেখতে পাই। এতে আমাদের মাঝে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য যে, এই কার্যক্রম

৫টি মহাদেশে কয়েকমাস পূর্ব হতেই (২৮-০৭-৯৩) প্রচার হতে থাকে। এ পর্যন্ত আমরা মাত্র ৪টি জামাতে (ঢাকা, আহমদনগর, তারুয়া ও চট্টগ্রাম) ডিশ এন্টেনার মারফত সরাসরি খুতবা শুনার ও দেখার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছি। ইনশাআল্লাহ্ যথা শীঘ্র এই ব্যবস্থাকে আরো ১০টি স্থানীয় জামাতে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। কেউ কেউ বাসায় স্থাপিত ডিশ এন্টেনার মাধ্যমেও আমাদের প্রোগ্রাম দেখে থাকেন। বড়ই সুখের বিষয় যে, তারুয়ার মত একটি পাড়াগাঁয়ে ক্ষুদ্র আহমদীয়া জামাতই সর্বপ্রথম অত্যাধুনিক গণমাধ্যম ব্যবহার দ্বারা ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ প্রচারের ব্যবস্থা নিয়েছে। অপর দিকে বড়ই বেদনাদায়ক যে, এই প্রচার কাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়ে মৌলভী-মৌলানাদের একদল জঘন্য মিথ্যা প্রচার দ্বারা আহমদীয়া জামা'তের এই শুভ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার অবাঞ্ছিত, অযৌক্তিক ও অ-ইসলামীক আন্দোলন চালাচ্ছে। এমনকি এতে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররামের খতীব সাহেবও আমাদের এই প্রচারকার্য না জেনে না দেখে জঘন্য মিথ্যা অভিযোগ আনতে কসূর করেননি। এই অপপ্রচার, ও লাগামহীন গালি-গালাজ সংক্রান্ত বিভ্রান্তি দূর করার জন্য আমরা যেসব ব্যবস্থা নিয়েছি তাহলো ঃ (১) একটি দাওয়াত পত্র দ্বারা স্থানীয় গণ্যমান্য লোকদেরকে আমাদের খলীফার খুতবা দেখতে ও শুনতে অনুরোধ জানিয়েছি (২) ডিশ এন্টেনার দ্বারা আমরা কি করি - সে সম্বন্ধে 'ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রচার' নামে একটি প্রচারপত্রও ব্যাপকভাবে বিতরণ করেছি। বস্তুতঃ স্যাটেলাইট/ ডিশ এন্টেনা দ্বারা মানুষ বিভিন্ন দেশের অশ্লীল নাচ-গান, ছবি দেখে থাকে যার ফলে সমাজ দিন দিন অবক্ষয়ে আক্রান্ত হচ্ছে। এ অবক্ষয় থেকে মানবজাতিকে বাঁচানোর জন্য এ অভূতপূর্ব প্রয়াস নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের। আমরা বাংলাদেশেও সপ্তাহের পবিত্র দিন শুক্রবার ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে আল্লাহ্র বাণী ও হযরত রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর হাদীসের আলোকে বিশ্ব খলীফার দেয়া জুমআর খুতবা শুনে থাকি। আমরা বার বার বিভিন্নভাবে প্রচার করে আসছি যে, এ ডিশ এন্টেনা মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়ার ভাড়া করা স্যাটেলাইটের দিকে তাক্ করা। এতে অশ্লীল বা কুরআন ও সুন্নাহ্র শিক্ষার পরিপন্থী কোন অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় না। এ অনুষ্ঠান দেখার জন্য (৩) আমরা একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছি, (৪) "প্রতিবাদ ও মিথ্যা অপপ্রচার কুরআন বিরোধী কাজ" নামে একটি লিফলেট ব্যাপকভাবে বিরতণ করা হয় যাতে এই মিথ্যা অপপ্রচারের জবাব দেয়া হয়েছে, (৫) ৫টি জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। এসব সত্ত্বেও তাদের অপপ্রচার মোটেও থামেনি। উল্লেখ্য যে, যারা অন্যের অযথা দোষ ত্রুটি অন্বেষণে এবং মিথ্যা প্রচারণায় অতিশয় তৎপর তাদের নিজের ঘরের খবর নেই। একটি দৈনিকের 'অভিমত' থেকে উদ্ধৃত অংশ তাই প্রমাণ করেঃ "বাংলাদেশের জাতীয় মস্জিদ 'বায়তুল মোকাররম'। এই মসজিদের নীচ তলায় গান বাজনা হয় এটা কোন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কাছে সহজে বিশ্বাসযোগ্য নয়, কারণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে অনেক কিছুই দেখার অবকাশ হয় না যার ফলে অচেতনতার দরুন শাস্তি যে কোন মুহূর্তেই পেতে হয়। মসজিদের নীচ তলায় গান বাজনার প্রধান উপকরণ নিয়ে প্রতিদিন চলছে জমজমাট ব্যবসা। উপর থেকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযান ধ্বনি কানে ভেসে এলেও তার প্রতি উত্তর দেওয়া তো দূরের কথা কোন বিরতি ছাড়াই চলছে ইংলিশ মিউজিক, হাজার হাজার ভিডিও ক্যাসেট প্লেয়ারে পাশ্চাত্য দেশের অশ্লীল ছবিগুলোও খরিদ্দারের উদ্দেশে প্রতিযোগিতার মন নিয়ে আকর্ষণীয়ভাবে প্রদর্শিত হচ্ছে।

মসজিদের উপরে দরূদ শরীফের ধ্বনি আর নীচে গান বাজনার ধ্বনি, দুই ধ্বনির সংমিশ্রণে ইবাদতকারীর ইবাদত পৌঁছে যাচ্ছে মহান দরবারে, আল্লাহ্ পাক যেটা ভাল মনে করছেন সেটা গ্রহণ করছেন। তার মানে হালাল হারাম সম্বন্ধে ইবাদতকারীরা সন্দিহান। গান বাজনা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ বিধান, যে মসজিদ দেশের সকল মসজিদের মাথা তা পরিশেষে যদি গানে মুখর হয় অর্থাৎ দোষণমুক্ত না হয় তবে তার ভুল অনুকরণে নিঃসন্দেহে অন্যান্য মসজিদের পরিবেশ, পবিত্রতা নষ্ট হবে। এক ফোটা বিষের ক্রিয়ায় যদি এক মন দুধ নষ্ট হয় তা হলে ইসলাম নিষিদ্ধ গান কি একই জায়গা থেকে মিশ্রিত হয়ে ইবাদত নষ্ট করতে পারে না?"

(দৈনিক সমাচারঃ ১৫/১২/৯৩ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে)

এ প্রসংগে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার নাম উল্লেখ না করে পারছি না। ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে আমরা যখন আল্লাহ ও রসূলের কথা প্রচার করি তখন পত্রিকাটি এতে 'নীল ছবি' দেখতে পায়। অথচ

অর্থ লোভে ও লাভের আশায় এই দৈনিকটি অশ্লীল বিজ্ঞাপনাদি ছাপিয়ে ইসলামের খেদমত করতে কোন কার্পণ্য করছে না!

লক্ষ্য অর্জনের পথ ও পাথেয়ঃ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের লক্ষ্য হলো কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শকে ভিত্তি করে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনকে কলুষ-মুক্ত করা এবং বিশ্বময় প্রকৃত ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা। এ মহান উদ্দেশ্য সাধনে যে চারটি বিশেষ উপাদানের আশ্রয় নিতে হবে তা হলো প্রচেষ্টা, প্রেম, প্রযুক্তি ও প্রার্থনা (সংক্ষেপে বলা যায় চার 'প')। প্রচেষ্টা হতে হবে বিরামহীন, ব্যাপক ও সুসংগঠিত। আল্লাহ্‌র বিধানে মোমেনদের জন্য সুসংগঠিত হওয়ার চিরন্তন পন্থা হলো নবুওয়ত ও তৎপরবর্তী খেলাফত। বর্তমান যামানায় একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'তেই উপরোক্ত উভয় ঐশী উপাদানের সংযোগ ও সমন্বয় দেখা যায়। তাই মানবীয় প্রচেষ্টায় খেলাফত প্রতিষ্ঠার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থতার সাক্ষ্য বহন করছে ও করবে।

আল্লাহ্‌র সমগ্র সৃষ্টি (যাকে তাঁর পরিবার বলা হয়), বিশেষ করে মানুষের জন্য অকৃত্রিম প্রেম থাকতে হবে। তা না হলে আমাদের সব প্রচেষ্টা বৃথা বাক্যে নিঃশেষ হয়ে যাবে। প্রেম দ্বারা বাহিত না হলে, কোন কথা কানের ভিতরে প্রবেশ করলেও তা মরমে স্থান পাবে না। এ জন্যই 'ধর্মে জোর জবরদস্তি নেই' বলে কুরআনে নির্দেশ রয়েছে। জবরদস্তিতে কুস্তি হতে পারে কখনও দোস্তি হয় না। ইসলামের নামে কথায় কথায়, অপ্রয়োজনে, যথাতথা, যে সে সশস্ত্র জেহাদ ঘোষণা করে। এরূপ পাগলামী দ্বারা ইসলামকে তারা বেহাত ও বেহাল করছে-এ বিষয় বুঝার ক্ষমতাও তথাকথিত ধার্মিকরা হারিয়ে ফেলছে। সমগ্র সৃষ্টির প্রতি প্রেম আমাদেরকে পরিবেশ দূষণ হতে বিরত রাখতে পারে।

তবলীগের কাজে আধুনিক প্রযুক্তিকে কেন গুরুত্ব দিতে হবে তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে হবে। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের 'সন্তান'। বিজ্ঞান প্রকৃতির রহস্য তথা নিয়ম-কানুনকে উদ্ঘাটন করে থাকে। প্রযুক্তি ওসবকে মানুষের জন্য (যন্ত্রপাতির মাধ্যমে) ব্যবহারিক রূপ দান করে। অনেকে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মাঝে বিপরীতমুখী দ্বন্দ্ব দেখতে পায়। তাই সাধারণতঃ তারা পবিত্রতা রক্ষার নামে ধর্মকে প্রযুক্তি হতে দূরে রাখতে প্রয়াশ চালায়। অথচ বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি পবিত্রতা বা অপবিত্রতার কারণ নয়। পবিত্রতার মূল কারণ হলো মানুষের নিজের মন-মানসিকতা। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার আচার-আচরণে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি নিজ থেকে আমাদের কোন মংগল বা অমংগল করতে পারে না। এগুলো আমাদেরকে শক্তি ও সুযোগ যোগায় মাত্র। সে শক্তি ও সুযোগকে কল্যাণ বা অকল্যাণে ব্যবহার করা মানুষের ইচ্ছার উপরে পূর্ণমাত্রায় নির্ভরশীল বিধায় মানুষই এজন্য দায়ী। ধর্মের ব্যাপারেও একথা খাঁটে। উল্লেখ্য যে, যন্ত্রের কল্যাণকর ব্যবহার আমাদের বহুযন্ত্রণা কমায়। অপর দিকে এর অপব্যবহার তথা ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবহার আমাদের যন্ত্রণা অনেকগুণ বাড়ায়। মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী যন্ত্র বানাতে ও ষড়যন্ত্র করতে পারে না।

আমরা (আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্য) বিজ্ঞান ও ধর্মকে যে দৃষ্টিতে দেখি তা হলো-বিজ্ঞান স্রষ্টার কর্মের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে ও তা নানাভাবে কাজে লাগায়। অপরদিকে ধর্মে ঘটে স্রষ্টার ইচ্ছার প্রকাশ। একই স্রষ্টার কর্মে ও ইচ্ছায় বিরোধ থাকতে পারে না। মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতা বা উদ্দেশ্যের দীনতা হীনতাই অযথা এ দু'য়ের মাঝে বিরোধ ঘটায়।

বিজ্ঞানের কার্যকারিতা আমাদের ব্যবহারিক তথা দৈহিক ও জাগতিক জীবনের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। অপরদিকে ধর্ম বিশেষভাবে আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত। অবশ্য ধর্ম জীবনের কোন দিককেই অযথা অবহেলা করে না। বরং এসবের সুসমন্বয় সাধনই ধর্মের কাজ। অনুধাবন করার বিষয় এই যে, স্রষ্টা আমাদেরকে দু'হাত, দু'পা, দু'চোখ দু'কান, দান করেছেন। ডান-বামের প্রশ্ন তুলে বা দু'টোর যে কোন টাকে বাহুল্য মনে করে বাদ দিতে গেলে শুধু অমংগলেরই কারণ হবে না, অংগহানিও হবে– হবে বোকামির চূড়ান্ত। বরং সব অংশের সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাঝেই জীবনের পূর্ণতা ও সার্থকতা লুকিয়ে আছে। এ প্রেক্ষিতেও ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক বিবেচনার দাবী রাখে।

অগ্রগামিতা ও পশ্চাৎমুখিতা ঃ

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপব্যবহার মানুষের অস্তিত্ব ও সমগ্র পরিবেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নানা মারণাস্ত্র এমন কি আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা গণহত্যার জন্য ভয়াবহ রাসায়নিক দ্রব্যাদি, মারাত্মক রোগ জীবাণুর ব্যবহার ও নানা ধরনের শক্তিশালী নেশা জাতীয় দ্রব্যাদির ব্যাপক প্রচলন আমাদের অস্তিত্বকে কি প্রশ্নের সম্মুখীন করেনি? ধর্মের অপব্যাবহারও নানা রূপ ধারণ করে থাকে। তন্মধ্যে গোঁড়ামি, মুনাফেকি ও সাম্প্রদায়িকতাকে প্রধান বলে গণ্য করা যায়। এগুলোর বিস্তার ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনকে এমনকি আন্তর্জাতিক জীবনকেও নানাভাবে কন্টকিত করে তোলে। এ সবের কারণে একই ধর্মের ফেরকায় ফেরকায় মারামারি, খুনোখুনী হয়; হয় মারাত্মক গৃহযুদ্ধ এমনকি একদেশ অন্যদেশের সাথেও রক্তক্ষয়ী রণে লিপ্ত হয়। পুরাকালের ইতিহাসই নয় বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসও এতে কম কলংকিত হচ্ছে না। সংক্ষেপে বলা যায়, বিজ্ঞান ও ধর্মের সঠিক ব্যবহার যেমন জীবনকে সুখ শান্তির সাথে অগ্রগামিতা দান করে তেমনী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অপব্যবহার এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি, অজ্ঞতা, সংকীর্ণতা ইত্যাদিও মানব সমাজকে ভীষণভাবে পশ্চাৎমুখী করে তোলে। এ যামানায় বসবাস করেও অন্ধ-ধার্মিকরা মন-মানসিকতায় শত শত বছর পেছনে পড়ে আছে। প্রেম-প্রীতি ও যুক্তিকে বিদায় দিয়ে তারা জোর করে, শাস্তি দিয়ে অন্যদেরকে নিজেদের দলভুক্ত করে নিতে চায়। সরকারকেও একাজ করতে বাধ্য করতে চায়।

মানব সমাজে অগ্রগামী ও পশ্চাৎমুখী দলের উপস্থিতি নতুন নয়। অতি প্রাচীন কাল হতেই মানুষ নিত্য নতুন সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে মেতে উঠেছে। তাদের অক্লান্ত সাধনায় কৃষি, শিল্প (সামান্য লাংগল হতে ট্রাক্টর, কলকারখানা ইত্যাদি), ব্যবসাবাণিজ্য, যাতায়াত (যান বাহন তথা পশুর ব্যবহার হতে রকেটে উত্তোরণ) যোগাযোগ (টেলিগ্রাম, টেলিফোন, ফ্যাক্স ইত্যাদি) ভাব বিনিময়ের জন্য গণমাধ্যমসমূহের উদ্ভাবন ও ব্যাপক ব্যবহার (যেমন, কাঠির সামান্য কলম হতে আধুনিক প্রেসসমূহে বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকাদির প্রকাশ, রেডিও, টিভি, ভূ-উপগ্রহ, ডিশ এন্টিনা প্রভৃতির আবিষ্কার ও ব্যাপক প্রচলন তথা ২৪ ঘন্টা বিরামহীন কর্মসূচী) ইত্যাদি মানুষকে সর্বক্ষেত্রে অভূতপূর্ব ও অকল্পনীয় গতি দান করেছে। শত বছর আগেও যা আমরা ভাবতে পারিনি এখন তা হয়েছে বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবনের নিত্য সাথী। ফলে ঘরে বসেই আমরা বিশ্বের তাৎক্ষণিক ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করছি। গত দু'টো মহাযুদ্ধের কথা বিবেচনা করলে এ যামানাকে মানুষ কর্তৃক প্রযুক্তিগত মহাদুর্যোগ সৃষ্টির যমানাও বলা যেতে পারে। এ দুর্যোগের প্রধান কারণ হলো অবক্ষয়। অবক্ষয়ের আগ্রাসনে আদম সন্তানেরা মানবতাবোধকে পিষে মারে, নৈতিকতা বোধকে বোকামি বলে, আধ্যাত্মিকতাবোধকে বিদ্রূপ করে। এর কি কোনই প্রতিকার নেই?

এরূপ দুঃসহ অবস্থার পরিবর্তনের জন্যই আল্লাহ্ নবী পাঠিয়ে থাকেন। নবী তাঁর শিক্ষা ও আদর্শকে প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সমকালীন প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার করে থাকেন। তাঁর নিষ্ঠাবান অনুগামীরাও তা করেন। আল্লাহ্ আমাদের চলার জন্য দু'টো পা দিয়েছেন। তাই বলে প্রাচীন কালের নবীগণ গরু, ঘোড়া, উট, খচ্চর তৎকালীন নৌযানাদি ব্যবহারে কুণ্ঠাবোধ করেন নি। নূহ (আঃ)-এর কিশ্‌তি তো ধর্মের ইতিহাসের এক অমূল্য ও অফুরন্ত সম্পদ। পূর্বেকার কিতাবাদি ও কুরআন হাতে লিখা হতো। এসব কি এখন প্রেসে ছাপা হয় না? কুরআনের ও ইসলাম সংক্রান্ত অনেক বক্তৃতার ক্যাসেট করে প্রচার করা হচ্ছে। তখন পত্র-পত্রিকাদিও ছিল না। এ সবের মাধ্যমে ধর্মীয় বিষয়াদি প্রচারকে যারা হারাম বলে গণ্য করেন তাদের দায়িত্ব হলো ঐশী গ্রন্থাদি হতে তাদের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ পেশ করা। নতুবা নিজেদের রুগ্ন মানসিকতাকেই প্রাধান্য দেয়া হবে। প্রায়ই দেখা যায় অভ্যস্ত প্রযুক্তিকে তারা হালাল ভাবে। নতুন কিছু আসলেই আগপিছ বিবেচনা না করে ইহাকে 'হারাম' বলে ফতোয়া জারি করে বসে। কিছুদিন পর ইহা তাদের কাছে হালাল হয়ে যায়। এরূপ পশ্চাৎমুখী ধ্যান-ধারণা দ্বারা বর্তমান দুনিয়ার চাহিদা মেটানো যাবে কি? এতে বরং অবক্ষয়কেই বিনা বাধায়, বিনা চ্যালেঞ্জে আধুনিক প্রযুক্তির হাতে তুলে দেয়া হবে। বর্তমান পরিবেশ ও প্রেক্ষিতে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিষ্ঠাবান উম্মতের বড় দায়িত্ব হলো

প্রযুক্তির সব সুযোগকে ব্যবহার করে সারা দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র বাণীকে পৌঁছে দেয়া। আগামীতে উন্নততর মানের প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হলে জীবনের মান উন্নয়নে তা গ্রহণ করতে হবে। সমতালে নৈতিকতার উৎকর্ষও সাধন করতে হবে। তবেই আমরা কোরআনে নির্দেশিত দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের অধিকারী হতে পারি।

বড়ই বেদনাদায়ক যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ডিশ এন্টিনার মাধ্যমে তা করতে গিয়ে মুসলমানদের একটি অংশ দ্বারা পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। অথচ ঘরের টিভিতেও তারা আযান, কুরআন তেলাওয়াত ও এর ব্যাখ্যা, হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শুনছে দেখছে। যে মাইক ব্যবহারকে তারা হারাম মনে করতো (এখনও কিছু কিছু মুসলমান তা মনে করেন এবং হজ্জের সময়ে মাইক ব্যবহার করা হয় বলে তারা হজ্জও করেন না) তাদের মসজিদেই এখন মাইক স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। এখন তারা যাই মনে করুন না কেন অদূর ভবিষ্যতে তারা এই পশ্চাৎমুখিতা কাটিয়ে ডিশ এন্টিনার মাধ্যমে ইসলামী অনুষ্ঠানাদি প্রত্যক্ষ করে খুশী হবেন, তৃপ্তি পাবেন তা বলা বোধ হয় অদূরদর্শিতা হবে না। ঘরকে যেন পরের হাতে ছেড়ে দিয়ে সুখের ঘুম না ঘুমাই সে জন্যে সজাগ থাকতে হবে, সক্রিয় হতে হবে।

পরিসংখ্যানের পরিহাস ঃ

বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা প্রায় ৫৬০ কোটি। মুসলমানদের সংখ্যা ১২৫ কোটি বলা হয়। এতে অমুসলমানের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩৫ কোটি। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নবুওয়তের দাবী করেছেন প্রায় ১৪শত ২৭ বছর পূর্বে। এ দীর্ঘকাল গত হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বনবীর উম্মতের সংখ্যা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার $\frac{১}{৪}$ অংশেরও কম। এ অবস্থা কি হুযুর (সাঃ)-এর উম্মতের তবলীগ তথা প্রচার কাজে নিষ্ক্রিয়তার প্রমাণ বহন করে না? উপলব্ধি করার সময় অতিক্রম করে যাচ্ছে যে, শুধু তথাকথিত নামকাওয়াস্তে মুসলমান দ্বারা বিশ্বনবীকে বিশ্বময় প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। এজন্য চাই যোগ্যতার সাথে সামগ্রিক তবলীগি প্রচেষ্টা। পেছনে পড়ে থাকার অন্যতম ভয়াবহ কারণ হলো ফতোয়ার দ্বারা নিজেদের মধ্যে এক ফের্কা অন্য ফের্কাকে কাফের বলে ইসলাম থেকে বের করে দেয়ার দীর্ঘ-আচরণ। এতে ১২৫কোটি মুসলমান বলে দাবী করার ওপর ভীষণ আঘাত হানা হয়। উদাহরণ নিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। ধরা যাক সুন্নীর সংখ্যা ৬০কোটি, শিয়াদের সংখ্যা ৩০কোটি আর অন্যান্য সব ফের্কা মিলে ৩৫কোটি। সুন্নীরা যদি অন্যান্যদের কাফের মনে করে তবে তারা বলতে পারে না যে, মুসলমানদের সংখ্যা ১২৫কোটি। সত্যের খাতিরে তাদের বলা উচিত পৃথিবীতে মুসলমানের সংখ্যা মাত্র ৬০কোটি। নতুবা তাদের পক্ষে অন্যান্য মুসলমানদের কাফের বলাটাই মিথ্যা। অন্যান্য ফের্কার বেলাতেও একথা খাঁটে। তাই পরিসংখ্যানগত এই বিভ্রান্তি নিজেদের জন্য পরিহাস হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বস্তুতঃ বিশ্বময় ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং নিজেদের মধ্যকার সব বিভ্রান্তি দূর করার মহান উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ ও রসূল (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদীরূপে মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ) প্রেরিত হয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামা'ত সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করে ইতিমধ্যে ১৩৭টি দেশে মসজিদ ও মিশন তথা প্রচার কেন্দ্রাদি স্থাপন করেছে। বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় সংখ্যাগুরুদের সম্বন্ধে যে কথাটা বলা অপ্রাসংগিক হবে না তা হলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা শিরকের স্থান দখল করে আছে। প্রায়ই দেখা যায় সংখ্যাগরিষ্ঠরা দেশের সংখ্যলঘুদের প্রতি নিজেদের ধর্মগ্রন্থের ভিত্তিতে নয় বরং হীন স্বার্থের তাগিদে আইন-কানুন চালু করার প্রয়াশও চালায়। তাদের এই প্রবণতা যখন চরমে পৌঁছে তখন তা শিরকের রূপ ধারণ করে। কেননা তখন তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় নয়, সংখ্যার বলে বলীয়ান হয়ে সংখ্যালঘুদের প্রতি যদৃচ্ছা ব্যবহারে মেতে উঠে।

ডিশ এন্টেনা নিয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনায় এজন্যই যেতে হলো যে, অদূর ভবিষ্যতে এটিই আমাদের তবলীগের প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়াবে। এজন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ৭ জানুয়ারী ('৯৪) হতে রোজ ১২ ঘন্টার প্রোগ্রাম নেয়া হয়েছে। এতে বাংলাসহ আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় প্রোগ্রাম প্রচার করা হচ্ছে। বস্তুতঃ ডিশ এন্টেনার প্রচারে অন্যান্য অনেক গণমাধ্যমের সমাবেশ ও সমন্বয় করা যায়। তৎক্ষণাৎ বিশ্ব ব্যাপী ঘরে ঘরে পৌঁছা যায়। কোন ভৌগলিক বাধা এসে এর পথ ও গতি রোধ করতে পারে না।

সম্মেলন মহাসম্মেলন ঃ

প্রাচীন কাল হতেই আদম সন্তানেরা নানা উদ্দেশ্যে বিশেষ করে নিজেদের মতাদর্শ প্রচারের জন্য সম্মেলন এমনকি মহাসম্মেলন করে আসছে। বর্তমান যুগে এসবের সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে, বেড়ে চলেছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)ও সম্মেলন মহাসম্মেলন করেছেন। এসবে তিনি ভাষণ দিয়েছেন যা দুনিয়াবাসীর জন্য অমূল্য সম্পদ। বিদায় হজ্জের মহাসম্মেলনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণ বিশ্বখ্যাত হয়ে আছে। নবী করীম (সাঃ)-এর এসব ভাষণ হতে আমরা কী উদ্দেশ্যে, কী নীতি ও পদ্ধতিতে আমাদের সম্মেলন মহাসম্মেলন করবো এর সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা পাই। এসব আমরা ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতে পারি। এক্ষেত্রে হুযুর (সাঃ)-এর সুন্নত অনুসরণের যে ব্যাপক সুযোগ আছে তা আমাদের গভীরভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। এ যমানায় জনগণকে উত্তেজিত করে কীভাবে দুনিয়ার অপরিমেয় ক্ষয়-ক্ষতি ও জাতির ধ্বংস করা যায় সে উদাহরণের অভাব নেই, যেমন হিটলার মুসোলিনী। আমরা তাদের অনুসারী না হয়ে পড়ি সেজন্য সদা সতর্ক থাকতে হবে।

হুযুর (সাঃ)-এর ভাষণসমূহে কোরআন শরীফের শিক্ষা অনুযায়ী আল্লাহ, রসূল ও যাঁরা হুকুম দেয়ার অধিকারী তাঁদের প্রতি আন্তরিক আনুগত্যের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ধৈর্য, ঐক্য, সৌহার্দ্য, সহমর্মিতা, সহযোগিতা, মিলেমিশে বসবাস, পরিবেশ তথা সমগ্র সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধ এসবকেও বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা অবহেলা দেখানো হয়নি। হিংসা-বিদ্বেষ ঘৃণা গর্ব অহংকার ছড়ানো, হুমকি, উস্কানী অশান্তি বাড়ানো, জ্বালাও পোড়াও, কাট-মার শ্লোগানে পরিবেশ ভারাক্রান্ত করার নির্দেশ বা প্রয়াস বিশ্বনবী ও তাঁর খলীফা এবং সাহাবাগণ (রাঃ) কেন, কোন নবী ও তাঁর নিষ্ঠাবান অনুসারীদের আচরণে থাকতে পারে না, ছিলও না।

অপর দিকে প্রচুর অর্থ, সময়, শক্তি, সামর্থ্য ব্যয় করে (কেউ কেউ অপব্যয়ও বলছেন) একটি অতি ক্ষুদ্র জামাতের বিরুদ্ধে বহু স্থানীয় সম্মেলন করে দেশময় নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করতঃ ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৯৩) তারিখে ঢাকাস্থ মানিক মিয়া এভিনিউতে অনুষ্ঠিত তথাকথিত 'আন্তর্জাতিক তাহাফফুজে খতমে নবুওত'-এর (বাস্তব এটি জামাতে ইসলামীরই মদদ পুষ্ট) 'মহাসম্মেলনে' পবিত্র ইসলাম ও নবী করীম (সাঃ)-এর মহান শিক্ষা ও সুন্নতের কতটুকু প্রতিফলন ঘটেছে তা আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বিচার বিবেচনা করে দেখার জন্য বিনীতভাবে প্রিয় দেশবাসীর জাগ্রত বিবেকের কাছে আবেদন রাখছি।

পত্রিকাদির রিপোর্ট (কয়েকটি মৌলবাদি পত্রিকা বাদে) হতে দেখা যায় মাদ্রাসার শিক্ষক, ছাত্র (যাদের মধ্যে কিশোরের সংখ্যা ছিল প্রচুর) ইমামদের একটা অংশ হাজির ছিলেন। জনসাধারণের উপস্থিতি খুব কম থাকা সত্ত্বেও আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা তাদের দাবিদাওয়াকে দেশ ও জাতির দাবি বলে প্রচার করতে কসুর করছে না। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, 'সমগ্র জগৎ অবিশ্বাস্য হলেও সত্য চিরকালই সত্য এবং সমগ্র জগৎ সমর্থনকারী হলেও মিথ্যা চিরকালই মিথ্যা।' (হযরত মির্যা গোলাম আহমদ - আঃ)। আহমদীয়া মুসলিম জামাত ইসলাম প্রচারের জন্য বছরে বহু সম্মেলন এবং কাদিয়ান, রাবওয়া ও লন্ডনে বার্ষিক মহাসম্মেলনও করে থাকে। এসব সম্মেলনে এ জামাতের সদস্যরা যথাসাধ্য ইসলামী নীতি-নিয়মকে কার্যকর করতে প্রয়াস নেয়। যারা চান এতে উপস্থিত হয়ে আমাদের দাবীর বাস্তবতাকে চাক্ষুষ করে যেতে পারেন।

আন্তর্জাতিক বয়াত দিবস ঃ

১৯৯৩ সালের ১লা আগষ্টকে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক "বয়াত দিবস" হিসাবে প্রতিপালন করা হয়। সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, সেদিন স্যাটলাইটের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ৪র্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) বিভিন্ন দেশে আহমদীয়া জামাতে দীক্ষিত হওয়ার জন্য বয়াত গ্রহণ করবেন। এই যামানাকে 'দিবস' পালনের যামানা বলা হয়। জন্ম ও বিবাহ দিবস তো প্রায় ঘরে ঘরে প্রতিপালিত হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন কারণ ও উদ্দেশ্যে শুধু ভিন্ন ভিন্ন দেশেই দিবস পালন করা হয় না-জাতি সংঘের উদ্যোগে আন্তর্জাতিক ভাবেও বহু দিবস পালন করা হয়। এরূপ প্রত্যেক দিবসেরই কোন

না কোন বৈশিষ্ট্য থাকে। এসব সত্ত্বেও আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক আন্তর্জাতিক বয়াত দিবস পালন ছিল অনন্যসাধারণ ও তাৎপর্যমন্ডিত। এই দিবসে একই নেতার নিকট ১৩৭টি দেশের বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন রং এবং বিভিন্ন পরিবেশে প্রতিপালিত ২,০৪,৩০৮ (দুই লক্ষ চার হাজার তিনশত আট) জন নারী-পুরুষ একই সময়ে একই ব্যক্তিত্বের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন ও দোয়ায় শামেল হন। এই দোয়ার দৃশ্য কখনও ভুলবার নয়। সবাই সর্বশক্তিমান স্রষ্টার দরবারে নিজকে সমর্পণ করে দেয় এবং নিজের সব পূর্বগুনাহ্-খাতার জন্য অনুশোচনায় অশ্রুবর্ষণ করেন ও পরবর্তী জীবনকে ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষায় গড়ে তোলার জন্য দৃঢ় সংকল্প জ্ঞাপন করেন। সব ভেদা-ভেদ ভুলে সবাই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নগণ্য অনুসারী হিসাবে এক অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হন। সেদিন আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি যে, হযরত ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর মারফত আল্লাহ্তা'লা বিশ্ব মানবতার জন্য কল্যাণের অশেষ সম্ভাবনাসহ ইসলামকে পুনর্জীবিত করেছেন ও পুনর্বাসিত করতে চাচ্ছেন। আরো উপলব্ধি করি যে, এই ঐশী উদ্দেশ্য সাধনে আমাদেরকে সাধ্যমত কত বড় ও মহান দায়িত্ব পালন করতে হবে! বিশ্বনবীর উম্মত হিসেবে সারা বিশ্বেই ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদিগকে সর্ব প্রকার ত্যাগ-তীতিক্ষা স্বীকার করে বিরামহীনভাবে এগিয়ে যেতে হবে। এই কাজ ঘর থেকেই শুরু করতে হবে। নিজে প্রকৃত মোমেন হয়েই অন্যকে মোমেন হওয়ার আহ্বানের দায়িত্ব নিতে হবে।

স্থবিরতার বিদায় ঃ

আন্তর্জাতিক বয়াত দিবস প্রতিপালনের কয়েক মাস আগে আমাদের বিশ্বনেতা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ) বয়াত দিবসকে সফল ও সার্থক করার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশকে বয়াত করার টার্গেট দিয়ে তবলীগি প্রচেষ্টাকে জোরদার করার জন্য নির্দেশ দেন। বাংলাদেশের টার্গেট ছিল ১০০০ (এক হাজার)। আমাদের দেশে সাধারণতঃ বছরে ২০০/৩০০ (দুইশত/ তিনশত) ভাই-বোন বয়াত করে থাকেন। সেই স্থলে মাত্র দুই আড়াই মাস সময়ে বয়াতের টার্গেট পূরণ করা আমাদের কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেয়। উল্লেখ্য যে, তখন আমি খুব অসুস্থ ছিলাম, তাই আমি এই টার্গেটের চিন্তা করে কোন কুল কিনারা পাচ্ছিলাম না। যা হোক আমার সাথী ও সহকর্মীরা তবলীগের জন্য খাস প্রোগ্রাম করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে থাকেন। বলতে গেলে জামাতের সবাই তবলীগের কাজে মেতে উঠে ও পদে পদে দোয়ার সাথে অগ্রসর হতে থাকে। আল্লাহ্তা'লা এই প্রচেষ্টা ও আকুতিকে গ্রহণ ও ফলপ্রসূ করে তুলেন। ভাবতে অবাক লাগে যে, বহু বাঁধা-বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও এত স্বল্প সময়ে টার্গেট অতিক্রম করে প্রায় এর দ্বিগুণ লোককে বয়াত করাতে সমর্থ হয়। এর ফলশ্রুতিতে সারা দেশে শুধু আহমদীদের মধ্যেই নয় অ-আহমদী ভাই-বোনদের মধ্যেও আমাদের জামাত সম্বন্ধে জানার আগ্রহ অনেক বেড়ে যায়। এতে আমাদের স্থবিরতার বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে। সর্বস্তরে সজীবতা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। দীর্ঘ স্থবিরতার বিদায় বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের জন্য সুদূর প্রসারী ইঙ্গিত বহন করছে। এই ইঙ্গিতকে বাস্তবতায় রূপায়িত করার জন্য আমাদিগকে সদা সক্রিয় থাকতে হবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, এ বিদায় আমাদের দায়কে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

তবলীগ, তালীম, তরবীয়ত ও সাংগঠনিক সমস্যা ঃ

স্বল্প সময়ে এত বেশী লোক জামাতে দাখিল হওয়ায় যে-সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাদি দেখা দিয়েছে ইতিপূর্বে আমরা এমন অবস্থার সম্মুখীন হইনি। সময়ের দাবী মিটাতে গিয়ে আমাদের তবলীগি প্রচেষ্টাকে আগের চেয়ে অনেক বেশী জোরদার, ব্যাপক, অর্থবহ ও বাস্তবমুখী করতে হচ্ছে। আমাদের তালীমি প্রচেষ্টাকেও পূর্বেকার নিয়ম-নীতিতে আবদ্ধ রাখা যাচ্ছে না। সাথে সাথে নতুন ভাই-বোনদেরকে তালীম-তরবীয়তের মাধ্যমে প্রকৃত মোমেন করে গড়ে তোলার বিরাট দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। এই জন্য সব চেয়ে বড় সমস্যা হলো তাদেরকে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সর্বস্তরে আনুগত্যের সহিত খেলাফতের রজ্জুতে আবদ্ধ করা। এই সব বিষয়ে সমাপ্তি ভাষণে ইনশাআল্লাহ কিছু বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া

হবে। মোদ্দা কথা হলো, সমস্যা যত বড় হবে প্রচেষ্টাকে তত ব্যাপক করতে হবে। তাকওয়াতে তত বেশী মনোনিবেশ করতে হবে।

বিরোধিতার ভিন্ন দিকঃ

আমাদের বিরুদ্ধে তাহাফ্‌ফুজে খতমে নবুওয়তের আন্দোলন খুবই তীব্রতর হয়। এ সম্বন্ধে পূর্বেই বলা হয়েছে। এই বিরোধিতার সম্মুখীন হতে যেয়ে আমাদিগকে সাধ্যমত নানা প্রচেষ্টা চালাতে হয়েছে ও হচ্ছে। দুনিয়াবী দৃষ্টিতে বিরোধীদের তুলনায় ক্ষুদ্র জামাত হিসেবে আমাদের সাধ্যের পরিধি খুবই সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমাদের আল্লাহ্‌ সর্ব শক্তিমান। তাঁর সাধ্যের সীমানা টানা কারো সাধ্যের মধ্যে নেই। আমরা যতই তাঁর দিকে ঝুঁকেছি ততই তাঁর সাহায্য সহায়তা পেয়ে অভিভূত ও ধন্য হয়েছি। এমনকি কোন কোন স্থলে তাঁর সাহায্য নিদর্শন হয়ে আমাদের কাছে হাজির হয়েছে। এবার আমাদেরকে বাধ্য হয়ে সরকারের সাথে নানা ভাবে সংযুক্ত হতে হয়েছে। এ সংযুক্তিতে ইতি বা নেতী উভয় দিকই ছিল, এই নিয়ে আলোচনায় যাচ্ছি না। যা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে তা হলো আমাদের সংযুক্তি অতি আশ্চর্যজনকভাবে জনগণের সাথে অনেক বেড়ে গেছে। রোজই আমাদের বই-বুলেটিনাদি পাঠানোর জন্য সারা দেশের প্রত্যন্ত এলাকা হতে চিঠি-পত্র আসছে। বুদ্ধিজীবী মহল হতেও যথেষ্ট সাড়া মিলেছে। তাছাড়া দেশে পত্র-পত্রিকাদিতে (দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক) আহমদীয়া মুসলিম জামাত তথা 'কাদিয়ানীদের' নিয়ে বেশ দীর্ঘ দিন ধরে প্রচুর আলোচনা-সমালোচনা চলছে। বড়ই সুখের বিষয় যে, সামান্য কিছু মৌলবাদী পত্রিকাদি বাদে সব পত্রিকাতেই আমাদেরকে সরকার কর্তৃক অমুসলমান ঘোষণার দাবী যে নিতান্তই অযৌক্তিক তা-ই নানাভাবে তুলে ধরছে। এসব বিষয় বিবেচনা করলে দেখা যায় আল্লাহ্‌তা'লা এ ক্ষুদ্র জামাতকে বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যন্ত পৌছে দেয়ার পরিবেশ সৃষ্টিতে বিরুদ্ধবাদীদের প্রচেষ্টাকেও আমাদেরই কাজে লাগাচ্ছেন। তাঁর খেলা বড়ই আজব, বড়ই মহৎ!

উপসংহার ঃ

বর্তমান পরিবেশে বাংলাদেশ আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রত্যেক ভাই-বোনকে নতুন করে উপলব্ধি করতে হবে যে, আমরা যদি আমাদের অগ্রগতিতে বাঁধা হয়ে না দাঁড়াই তবে কোন বাঁধাই আমাদের অগ্রগতিকে থামাতে পারবে না। আমরা আমাদের পথে বাঁধা না হওয়ার জন্যে নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যবোধকে বিশেষভাবে সজাগ ও সক্রিয় রাখতে হবে। গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে, অনৈক্যই মুসলমানদের চরম অবনতি ও দুর্গতির প্রধান কারণ। আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি আনুগত্যকে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনে বাস্তবরূপ দিতে গিয়ে সাংগঠনিক আনুগত্যকে সদা কার্যকর রাখতে হবে- অর্থাৎ খেলাফতের রজ্জু হতে যেন কখনও কেউ বিচ্ছিন্ন না হই সেজন্য সতর্ক থাকতে হবে। সর্বস্তরে জামাতি নেযামকে আঁকড়ে থাকতে হবে। শুধু কথায় নয় আচার-আচরণেও উন্নত মোমেন হওয়ার প্রয়াস চালাতে হবে। এ যুগে অর্জিত সভ্যতার যতই বড়াই করা হউক না কেন মানবতা যে হিংসাদ্বেষ, বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা, মারামারি, খুনা-খুনীতে জর্জরিত তাতে দ্বিমতের কোনই অবকাশ নেই। এর বড় কারণ হলো সমাজের সর্বস্তর হতে (স্থানীয় জাতীয় বিশ্ব সমাজের) প্রেম, প্রীতি ভালবাসা বিদায় নিয়েছে। এ বিদায় যেন মহাদুর্ভিক্ষরূপে দেখা দিয়েছে। এই দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হতে মানবতাকে রক্ষার মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য আমাদের এসবকেই (প্রেম-প্রীতি ভালবাসাকেই) মূলধন হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কুরআন সুন্নাহ্‌ ও হাদীসের নির্দেশ মত এসবকে সঠিকভাবে কার্যকর করে তুল্লে কোন শক্তিই যে আমাদের গতিরোধ করতে পারবে না তাতে আমরা নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহ। প্রতি পদেক্ষেপে আল্লাহ্‌ আমাদের সহায় হউন দরদে দিলে এই কামনা করছি। আমীন।

বিনীত

৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ইং

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর

কোঁপল (নতুন কুঁড়ি) *

(৫ থেকে ৭ বছরের শিশুর জন্যে তা'লীম তরবীয়তি পাঠ্য-সূচী)

অনুবাদ : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

"প্রত্যেক শিশু সঠিক প্রকৃতির ওপরে জন্ম নেয় আর তার মধ্যে পুণ্য করার শক্তি নিহিত থাকে। পরে তার মা-বাপ শিক্ষা দিয়ে কখনও তাকে ইহুদী বানিয়ে দেয়, কখনও খৃষ্টান বানিয়ে দেয় এবং কখনও মূর্তিপূজারী বানিয়ে দেয়।" (বুখারী)

তোমরা অবগত আছ, বরষায় যখন আমের আঁটির চাড়া মাটিতে অংকুরিত হয় তখন শিশুরা উহা উপড়িয়ে বাঁশি বাজায়। কিন্তু ঐ আমের চারার বয়স যখন ৫/৬ বছর হয় তখন একটি শিশুর ৫/৬ বছর বয়স হওয়ায় সে আরও শক্তিশালী হয়। কিন্তু পরে উহা (আমের চাড়া) উপড়ানো তার জন্যে কষ্টকর হয়। অতএব বুঝা গেল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মূল শিকড় মাটিতে মজবুতভাবে পুঁতে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত উহা উপড়ানো সহজ আর মূল শিকড় মজবুত হয়ে যাবার পরে কু-অভ্যেসসমূহ ও ধর্মীয় বিশ্বাসসমূহও গাছের ন্যায় হয়ে থাকে। খারাপ অভ্যেস বাল্যকালে দূর করা সহজসাধ্য কিন্তু শিকড় জড়িয়ে গেলে উহাকে উপড়ানো অর্থাৎ উহাকে পরিত্যাগ করানো অসম্ভব হবে। কোন কোন শিশুর মিথ্যে বলার অভ্যেস হয়ে থাকে। যদি প্রথম থেকেই উহা দূর করার চেষ্টা না করো তাহলে পরে উহা দূর করা কষ্টকর হবে। আমরা দেখেছি যে, যাদের বাল্যকালে মিথ্যে বলার অভ্যেস হয়ে যায়, বড় হয়ে আলেম ফাযেল হয়েও মিথ্যের অভ্যেস তাদের থেকে দূর হয় না।"

{ হযরত মৌলভী হাকিম নূরুদ্দীন, খলীফাতুল মসীহ আওওয়াল (রাঃ)—বদর : ২৮শে জানুয়ারী, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ }

পরিচিতি

আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহঃ) আমাদের আহমদী মহিলাদেরকে একটি শ্লোগান প্রদান করেছিলেন :

'সাচ্চে আহমদী কি মা-যিন্দাবাদ' অর্থাৎ 'সত্যবাদী আহমদীর মা—যিন্দাবাদ'

এ শ্লোগানকে প্রতিষ্ঠিত ও স্থায়ী রাখার জন্যে, লাজনা ইমাইল্লাহ, করাচী আল্লাহ্‌তা'লার ফযল ও করমে এরূপ মায়েদের পথ-নির্দেশের জন্যে, যারা শিশুদের তরবীয়তকে বিশেষ গুরুত্ব দেন, এরূপ শিক্ষণীয় পাঠ্য-সূচী প্রণয়ন করেছে যা শিশুদের বয়সানুক্রমে ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের আকারে সন্নিবিষ্ট। পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর জন্যে প্রথম পাঠ কোঁপল (নতুন কুঁড়ি) এ পর্যায়ে প্রথমে পেশ করা যাচ্ছে।

---

* ওয়াকফে নও-এর পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত পুস্তকা। পরে পুস্তকাকারে ছাপানো হবে, ইনশাআল্লাহ—অনুবাদক

খোদা করুন যে, আমাদের চেষ্টার সুফল প্রকাশিত হোক এবং লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি সংখ্যায় মোজাহেদ মা মোজাহেদ প্রজন্মের তরবীয়ত দিয়ে উল্লেখিত স্লোগানকে জীবন্ত ও স্থায়ী রাখুন, আমীন।

এ পাঠ্য-সূচী প্রস্তুত করতে ইসলাহ ও ইরশাদ এবং ইশায়াত বিভাগদ্বয়ের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ পর্যায়ে সাহায্য ও সহায়তাকারিণী বোনদের জন্যে বিশেষভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

খাকসার
সলীমা মীর
সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ, করাচী

তওহীদ (একত্ববাদ)

১। মা—আমাকে এই আদরের সোনামনিকে কে দিয়েছেন?
শিশু—আল্লাহ্‌তা'লা

২। মা—খাবার জিনিস, ফল, দুধ এসব কে দিয়েছেন?
শিশু—আল্লাহ্‌তা'লা।

৩। মা—চাঁদ-মামা, সূর্য, পৃথিবী কে তৈরী করেছেন?
শিশু—আল্লাহ্‌তা'লা।

৪। মা—আল্লাহ্‌তা'লার পূর্ণ নাম কি?
শিশু—আল্লাহ্‌তা'লা।

৫। মা—আল্লাহ্‌তা'লা কি একজনই?
শিশু—আল্লাহ্‌তা'লা একজনই।

৬। মা—'আল্লাহু আকবর' অর্থ কি?
শিশু—আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।

৭। মা—আল্লাহ্‌তা'লার কতটি নাম?
শিশু—আল্লাহ্‌তা'লার অসংখ্য নাম আছে।

৮। মা—এক নাম তো আল্লাহ্‌তা'লা বাকী নামগুলো কি কি?
শিশু—রব্ব্ (প্রভু—প্রতিপালক), রহমান (অযাচিত-অসীম দাতা), রহীম (পরম দয়াময়)।

৯। মা—কলেমা শুনাও তো আব্বু।
শিশু—কলেমা তাইয়্যেবা—তাইয়্যেবা অর্থ পবিত্র
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্।

১০। মা—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অর্থ কি?
শিশু—আল্লাহ্ ব্যতিরেকে কোন উপাস্য নেই।

১১। মা—মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ অর্থ কি?
শিশু—মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহ্‌র রসূল।

১২। মা—কলেমা পাঠকারীকে কি বলে?
শিশু—মুসলমান।

১৩। মা—আরকানে ইসলাম (ইসলামের স্তম্ভসমূহ) বল তো সোনামনি।
শিশু—কলেমা, নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ।

(চলবে)

যাকাত সম্পর্কে বন্ধুদের খেদমতে একটি আবেদন

বর্তমানে জামায়াতে আহ্‌মদীয়া ছাড়া আর কারো বায়তুল মালের নেযাম নেই। যারা ইসলামের কথা বলেন—তারা সবাই শুধু বক্তৃতা সর্বস্বই নন—তাদের অনেকেই সঠিক ভাবে জানেনও না যে, যাকাত ব্যবস্থা কেন জারী করা হয়েছে এবং যাকাতের অর্থ কোথায় কার কাছে দিতে হবে। আল্লাহ্‌র ফযলে আমরা যেমন যামানার ইমাম হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে মানতে পেরেছি—তেমনি বর্তমানে আমাদের মধ্যে খেলাফতের নেযাম ও বায়তুল মালের নেযাম কায়েম রয়েছে।

যাকাত সম্বন্ধে আল্লাহ্‌তা'লা কুরআন করীমে বলেন—

"এবং তোমরা নামাযকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিও ও যাকাত দিতে থাকিও, আর তোমরা নিজেদের কল্যাণের জন্য পূর্ব হইতে যে-সব সৎকর্মের সংস্থান করিয়া রাখিবে—আল্লাহ্‌র নিকট তার সুফল লাভ করিবে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের সকল কর্ম অবলোকন করেন"।

(সূরা বাকারা ঃ আয়াত ১১১)

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি হলো যাকাত। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের উক্ত নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করা প্রত্যেক আহ্‌মদী বিশেষ করে অবস্থাপন্ন আহমদীর একান্ত কর্তব্য।

আমি জামা'তের অবস্থাপন্ন সদস্যদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের কাছে প্রদত্ত যাকাতের অর্থ থেকে প্রায় বেশ কিছু অক্ষম ও দরিদ্র পরিবারকে মাসিক অযিফা দেয়া হচ্ছে। তাছাড়াও কুরআনের নির্দেশ মোতাবেক জরুরী ভিত্তিতে গরীবদের সাহায্য করতে হয়। যাকাতের উদ্দেশ্য মোতাবেক জামা'তের সহায় সম্বলহীনদেরকে উপার্জনে সক্ষম করে তোলা আমাদের কর্তব্য—কিন্তু আমরা আজও সে পর্যায়ে পৌঁছতে পারিনি।

তাই জামাতের অবস্থাপন্ন সদস্যদের খেদমতে আমার বিশেষ অনুরোধ—যারা যাকাত দেয়ার সামর্থ্য রাখেন, তারা তাদের সম্পদের যাকাত খাকসারের খেদমতে আসন্ন রমযান মাসেই পেশ করবেন (যেহেতু রমযান বিশেষ কল্যাণ ও পুণ্য অর্জনের মাস), যাতে আপনাদের এ অর্থ জামা'তের নিঃস্ব ও অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করা যায় ও ঈদের আনন্দে তারা শরীক হতে পারেন।

আল্লাহ্‌তা'লা আপনাদের সকল প্রকার সম্পদে বরকত দান করুন, আমীন।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

সংবাদ

হুযূর আকদস (আইঃ)-এর সালাম

সম্প্রতি হযরত আকদস আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ) খাকসারকে লেখা একটি চিঠিতে বাংলাদেশে মোখলেফাতের সময় খোদ্দামদের সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকার জন্য সবাইকে মহব্বতপূর্ণ সালাম ও আন্তরিক মোবারকবাদের তোহ্ফা পাঠিয়েছেন।

কে, এম, মাহমুদুল হাসান
সদর, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ-এর নবগঠিত মজলিসে আমেলা

হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ) ১৯৯৩-৯৪ সালের জন্য নিম্নোক্ত মজলিসে আমেলা (কার্যকরী পরিষদ) অনুমোদন করেছেন। সকলের অবগতি ও দোয়ার জন্য উপস্থাপন করা হলো :

নং	পদবী	নাম
১।	নায়েব সদর-১	জনাব মোহাম্মদ আবদুস সামী
২।	নায়েব সদর-২	,, মাহবুব আযম রেজা
৩।	মোতামাদ	,, মোহাম্মদ সেলিম খান
৪।	এ্যডিশনাল মোতামাদ	,, সাইফুল ইসলাম
৫।	মোহতামীম খেদমতে খাল্ক	,, মাহফুজুর রহমান
৬।	মোহতামীম তালীম	,, এস, এম, রহমত উল্লাহ
৭।	মোহতামীম তরবীয়ত	,, শাহ নাসের মুহাম্মদ আদিল
৮।	মোহতামীম ইশায়াত	,, নূরুল ইসলাম মিঠু
৯।	মোহতামীম উমুরে তোলাবা	,, আবুল হাশেম
১০।	মোহতামীম উমুমী	,, রফিক আহমদ
১১।	মোহতামীম তাহ্রীকে জাদীদ	,, মিজানুর রহমান
১২।	মোহতামীম সেহেত ও জিসমানী	,, মুজিবুর রহমান কাকুল
১৩।	মোহতামীম ওয়াকারে আমল	,, আসাদুজ্জামান
১৪।	মোহতামীম মাল	,, নাসের আহমদ
১৫।	এডিশনাল মোহতামীম মাল	,, শাহ্ আজিজ মোহাম্মদ তালহা
১৬।	মোহতামীম সানাত ও তেজারাত	,, আহসান খান চৌধুরী
১৭।	এডিশনাল মোহতামীম সানাত ও তেজারাত	,, সৈয়দ হাসান মাহমুদ
১৮।	মোহতামীম আতফাল	,, মারুফ আহমদ

নং	পদবী		নাম
১৯।	মোহতামীম মোকামী	,,	আবদুল আলীম খান চৌধুরী
২০।	মোহতামীম তবলীগ	,,	মাহবুব আজম রেজা
২১।	মোহতামীম তাজনীদ	,,	আল-আমীন
২২।	মোহাসেব	,,	নাসের আহমদ (বনানী)

কে, এম, মাহমুদুল হাসান
সদর
মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

পত্র-যোগাযোগ

এতদ্বারা মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশের সকল সদস্যকে জানান যাচ্ছে যে, হুযুর (আইঃ)-এর সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য খোদ্দাম-আতফালদেরকে বেশী বেশী পত্র যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করছি। খেলাফতে আহমদীয়ার সাথে প্রত্যেক খাদেম ও তিফলের দৃঢ় সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। আর তার জন্য উত্তম পন্থা হচ্ছে পত্র-যোগাযোগ। যে-সকল খোদ্দাম-আতফাল ইংরেজীতে পত্র লিখতে পারেন না তারা বাংলায় লিখে খাকসারের নিকট প্রেরণ করলে আমি ইংরেজীতে তা অনুবাদ করে হুযুর (আইঃ)-এর নিকট প্রেরণ করে দিব ইনশাআল্লাহ্। অন্যান্য খাদেমগণও যদি ইংরেজী ভাষায় পত্র লিখে খাকসারের নিকট প্রেরণ করলে তা হুযুর (আইঃ) নিকট প্রেরণ করে দেয়া হবে। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সবাইকে হুযুর (আইঃ)-এর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ার তৌফিক দান করুন।

মোহাম্মদ আবুল হাসেন (শামীম)
মোহতামীম উমুরে তোলাবা
মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ

৩য় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত

আল্লাহ্তা'লার ফযলে গত ২৮শে জানুয়ারী সারা দিনব্যাপী ৩য় বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ। বিভিন্ন দিকে বক্তব্য রাখেন সর্বজনাব মোস্তাক আহমদ চৌঃ, জাকির হোসেন ভূঞা (ঘোড়াশাল), ডাঃ মোঃ আমিনুল ইসলাম (আমু চা বাগান), এস, এম, রহমত উল্লাহ, মৌঃ হাফিয উদ্দিন মাস্তান, মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী (সদর মুরব্বী)।

উক্ত অনুষ্ঠানে লাদিয়া, জামালপুর, হবিগঞ্জ থেকে আতফাল ও খোদ্দামরা অংশ গ্রহণ করেন।

কায়েদ, মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া
চান্দপুর চা বাগান।

'শান্তির জন্য শিক্ষা' শ্লোগানের উপর আলোচনা সভা

নাসেরাবাদ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে 'শান্তির জন্য শিক্ষা' শ্লোগানের উপর আলোচনা সভা গত ২০শে জানুয়ারী বাদ মাগরিব মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভাতে প্রায় ৩০ জন খোদ্দাম ও আতফাল উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ খাদেমুল ইসলাম, কায়েদ
মঃ খোঃ আঃ নাসেরাবাদ

তালীম ও তরবীয়তী ক্লাস

গত ১৯শে জানুয়ারী থেকে ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত মঃ খোঃ আঃ ডোহাণ্ডায় সপ্তাহ ব্যাপী তালীম ও তরবীয়তী ক্লাস খোদাতা'লার অশেষ ফযলে কামিয়াবীর সাথে সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

উক্ত ক্লাসে গড়ে ১০ জন করে খোদ্দাম আতফাল ছাড়াও ২/৩ জন অ-আহমদী যুবক লিখিত অংশ গ্রহণ করেন। ক্লাস পরিচালনা করেন মোয়াল্লেম এস, এল, তৌহিদুল ইসলাম।

কায়েদ, মঃ খোঃ আঃ ডোহাণ্ডা

তবলীগি সেমিনার '৯৪

গত ২৮/১/৯৪ইং তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল ১১টা হতে সারা দিনব্যাপী আহমদীয়া মুসলিম জামাত কানিয়ালখাতার উদ্যোগে এক তবলীগি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন রিজিওনাল কায়েদ রাজশাহী-১ জনাব কে, এম মাহবুব-উল ইসলাম। সদর মুরব্বী মাওঃ বশীরুর রহমান। সর্বমোট উপস্থিত ছিলেন ৩০ জন। তন্মধ্যে ১০জন জেরে তবলীগি বন্ধুর মধ্যে ৩জন বয়াত করেন। এতে সভাপতিত্ব করেন কানিয়াল খাতা জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব মোঃ মতলুবর রহমান প্রধান।

মোতামাদ
মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, সবুজপাড়া, নীলফামারী

আতফাল দিবস পালিত

আল্লাহ্‌তা'লার অশেষ ফজলে গত ১৪ই জানুয়ারী/৯৪ ইং তারিখে মাহীগঞ্জ মসজিদ প্রাঙ্গণে মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া রংপুর, মাহীগঞ্জ ও শ্যামপুরের যৌথ উদ্যোগে অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে আতফাল দিবস পালিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ্‌। কুরআন তেলাওয়াত, নযম পাঠ, আযান, বক্তৃতা, দীনি মালুমাতের লিখিত ও মৌলিক পরীক্ষা সহ বিভিন্ন খেলাধূলার আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতা এ দিবসের কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত ছিল।

বিকেল ৩টা থেকে মোহতারম কে, এম, মাহমুদুল হাসান, সদর বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া এর সভাপতিত্বে সমাপ্তি ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শুরু হয়, অভি-

ভাবকদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন সর্বজনাব মোহাম্মদ ইউনুস মিয়া, প্রেসিডেন্ট, আঃ মুঃ জাঃ মাহীগঞ্জ, মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম প্রধান, মোয়াল্লেম এবং কে, এম, মাহবুব উল ইসলাম, রিজিওনাল কায়েদ রাজশাহী-১। অতঃপর অনুষ্ঠানের সভাপতি মোহতারম সদর সাহেব বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং সভাপতি হিসাবে তার মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন।

মোহাম্মদ নূর আলম, নাযেম আতফাল
মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, মাহীগঞ্জ

গত ২৭/১/৯৪ ইং তারিখ মজলিসে আতফালুল আহমদীয়া সৈয়দপুর, চড়াই খোলা এবং নীলফামারী মজলিসের উদ্যোগে আতফাল দিবস এবং খোদ্দামের বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়।

এই দিনে তিফলদের মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত, আযান, লিখিত পরীক্ষা, দৌড়, মোরগ লড়াই, লংজাম্প, বলনিক্ষেপ ইত্যাদির প্রতিযোগিতা হয়। সমাপনী অধিবেশন শুরু হয় বিকেল ৩টায়। আতফালুল আহমদীয়া কি এবং কেন, নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন যথাক্রমে রিজিওনাল কায়েদ মাহবুবুল ইসলাম এবং সদর মুরব্বী মাওলানা বশীরুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন নিলফামারী জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব জাহিরুল হক। এতে ২৮ জন আতফাল, ২০ জন খোদ্দাম ও ১০ জন আনসার উপস্থিত ছিলেন। এই দিবসে কয়েকজন গয়ের আহমদী ভ্রাতাও উপস্থিত ছিলেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই অনুষ্ঠানে ৪ জন বয়াত গ্রহণ করেন।

মোঃ মাহফুজার রহমান

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী

এস, এম, এরফান, জনাব এস, এম, হাবিবুল্লাহ্‌ সাহেবের ছেলে ৫ম শ্রেণী থেকে মোট ৫০২ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে শিমরাইল কান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে।

মোঃ আব্দুল কাইয়ুম জনাব মোঃ আবুল কালাম সাহেবের ছেলে ৮ম শ্রেণী কেথে মোট ৮১৯ নম্বর পেয়ে অন্নদা সরকারী হাই স্কুল থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের ভবিষ্যত কল্যাণময় জীবনের জন্যে দোয়ার আবেদন করা যাচ্ছে।

মোঃ মিনারুল ইসলাম
নাযেম ওমরে তালাবা
মঃ খোঃ আঃ বি, বাড়িয়া

শুভ বিবাহ

মোয়াল্লেম শাহ আলমের বিবাহ গত ৩১শে ডিসেম্বর বীরগাঁও নিবাসী জনাব শরাফত আলী সাহেবের প্রথমা কন্যা মরিয়ম সিদ্দিকীর সহিত ২০,০০০ টাকা মোহরানা ধার্যে সু-সম্পন্ন হয়। আলহামদুলিল্লাহ। এ বিবাহ বা-বরকত হওয়ার জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

খন্দকার সাঈদ আহমদ (আনু মিয়া)
আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

সন্তান লাভ

গত ১১/১/৯৪ইং বিকাল পাঁচ ঘটিকায় আল্লাহ্তা'লা আমাদেরকে এক পুত্র সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। সকল আহ্মদী ভাই ও বোনের নিকট দোয়ার দরখাস্ত করছি যাতে নবজাতক সু-স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, সু-শিক্ষিত ও সর্বোপরি জামা'তের একজন উত্তম খাদেম হয়।

মোহাম্মদ আক্কেল আলী
প্রেসিডেন্ট (নিউ সোনাতলা) ও
মিসেস মোর্শেদা আলী

নারায়ণগঞ্জ আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'তের সেক্রেটারী তবলীগ এবং আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ এর কাযা বোর্ডের সদস্য এডভোকেট তাইজউদ্দিন আহমদ সাহেবকে আল্লাহ্তা'লা গত ২৪-১-৯৪ইং রোজ সোমবার বিকাল ৫-১০ মিনিটে নারায়ণগঞ্জ ২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে এক কন্যা সন্তান দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ। নবজাতিকা ও তাঁর মাকে যাতে আল্লাহ্তা'লা সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু দান করেন এবং নবজাতিকা যাতে দীনের উচ্চ মাকামের খাদেমা হয় তার জন্য সকল আহমদী ভাই বোনের নিকট দোয়ার আবেদন করছি। উলেখ, পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার জন্য ১০০/- (একশত) টাকা অনুদান দেয়া হয়েছে।

মিসেস শরীফা বেগম
প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ, নারায়ণগঞ্জ

দয়ালু আল্লাহ্র খাস নেয়ামতস্বরূপ গত ২৩শে ডিসেম্বর '৯৩ইং ৯ই পৌষ, ১৪০০ সাল বাংলা রোজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯-২৫মিঃ সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল যশোহরে (নিয়মিত চাঁদা আদায়কারিণী) আমার একমাত্র কন্যার কোলে সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে একটি পুত্র সন্তান এসেছে, আলহামদুলিল্লাহ। নবজাতকের পিতা ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব এ, এস, ইউ, এস সাইফুল্লাহ জেরে তবলীগে আছেন।

আল্লাহ্‌তা'লা যেন নবজাতককে ও তার মাকে সু-স্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু, দীন ও দুনিয়াবী উন্নতি দান করেন এবং নবজাতকের পিতাকে সত্য গ্রহণে তার হৃদয় দুয়ার উন্মোচন করে দেন। এর জন্য জামা'তের সকল ভাই ও বোনের নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি।

খাকসারের পক্ষ থেকে আহমদী পত্রিকার জন্য ১০০ টাকা (একশত) মাত্র অনুদান দেয়া হল।

আলহাজ্জ মোশাররফ হোসেন
কায়েদ, আ: মু: জা: যশোহর

শোক সংবাদ

আমার মগবাজার নিবাসী সম্মানিত বিয়াই জনাব মতিয়র রহমান, প্রাক্তন কাষ্টমস অফিসার বিগত ২৫শে নভেম্বর '৯৩ এন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে...রাজেউন)। তার রূহের মাগফেরাত ও দারাজাতের বুলন্দীর জন্যে সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করছি।

শেখ আবদুল আলী
(অবসর প্রাপ্ত) পোষ্ট মাষ্টার
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

গত কাল সকাল বেলা খাট হতে পড়ে গিয়ে আমার আম্মার পা ভেঙ্গে যায় এবং আজ (১৮-২-৯৪) ভোর রাত্র ৩-৪০ মিনিটের সময় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে......রাজেউন)। আমার মায়ের বয়স হয়েছিল ১২০ (একশত বিশ) বৎসর। আমার মা অত্যন্ত নেক আহ-মদী মহিলা ছিলেন। আমার মাকে যেন আল্লাহ্ জান্নাতুল ফেরদৌসে দাখিল করেন। তার রূহের মাগফেরাত কামনা করে দোয়ার আবেদন করছি।

খন্দকার সাঈদ আহমদ (আনুমিয়া)
আমীর, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত
ব্রাহ্মণবাড়ীয়া

আহমদীয়া মুসলিম জামাত সুন্দরবন এর প্রবীন আহমদী মো: আয়জদ্দীন গাজী গত ৮ই জানুয়ারী, '৯৪ সকাল ৯টায় ইন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে........রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হয়েছিল ৮৯ বৎসর। মরহুমের রূহের মাগফেরাত কামনার জন্য সকলের কাছে দোয়ার আবেদন থাকল।

সংশোধনী

১২শ সংখ্যা পাক্ষিক আহমদীতে কবি শামসুর রহমানের যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে তা আজকের কাগজের সৌজন্যে নয় ভোরের কাগজের সৌজন্যে হবে। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

—আহমদী।

যালিকা ফাযলুল্লাহে ইউতিহি মঁাইয়্যাশা

"এ পর্যায়ে সবচে' আনন্দের কথা এই যে, বাংলাদেশ এ বিষয়ে (অর্থাৎ মুসলিম টি, ভি, আহমদীয়ার জন্যে প্রোগ্রাম তৈরী করে দেয়া—অনুবাদক) সকল জামা'তের মধ্যে অগ্রগণ্য। আর প্রথম যে প্রোগ্রাম আমাদের নিকট পৌঁছে দিয়েছে তা বাংলা ভাষার এবং উহা জামা'তে আহমদীয়া বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এসেছে। কয়েকটি ভিডিও তারা খুবই তাড়াতাড়ি অথচ উত্তমভাবে তৈরী করেছে। ধীরে ধীরে ইনশাআল্লাহ্ যেভাবে অভিজ্ঞতা বেড়ে যাবে খোদার অনুগ্রহের সাথে প্রোগ্রাম অধিক থেকে অধিকতর চমৎকার হতে থাকবে ও সুন্দর হতে থাকবে।"

(হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)-এর ৮-১-৯৪ তারিখের খুতবা দ্রষ্টব্য)

৬৪ পৃষ্ঠার পর

১/১১/৮৮)। উল্লেখ্য যে, চিনিউটবাসী মঞ্জুর চিনিউটিকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে (ইনরুজ ৭/৭/৮৯)। এই অবাঞ্ছিত ব্যক্তি এখন বাংলাদেশে বাজার গরম করছে। তাহফুজে খতমে নবুওয়তওলারা বিভিন্ন শহরে দেয়ালগুলিতে 'কাদিয়ানী সম্প্রদায় কাফের' বলে চিকা মেরেছে। টাকার নোটে পর্যন্ত 'কাদিয়ানীরা কাফের' ছাপ মেরেছে। মুখ্য অর্থ সচিব স্বাক্ষরিত এক টাকার একটি নোট (খচ ৫৪০৬১৯৭) আমাদের হাতে এসেছে। তাতে রাবার ষ্ট্যাম্প মারা হয়েছে 'কাদিয়ানীরা কাফের'। এ ব্যাপারে সরকারের কোন প্রতিক্রিয়া নেই। কারেন্সী নোটে কিছু লিখা ও ষ্টাম্প মারা আইনতঃ অপরাধ। কিন্তু আইনের ধারক পালকরা নীরব ভূমিকা পালন করছেন।

সম্প্রতি ইমাম সম্মেলন হয়ে গেল। এই উপলক্ষ্যে জাতীয় ইমাম সমিতি একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেছে। এই স্মরণিকার ২৬ পৃষ্ঠায় আছে, কাদিয়ানীদেরকে অমুসলমান ঘোষণার দাবী। আর এই স্মরণিকায় দস্তখতসহ বাণী দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী এবং ধর্মমন্ত্রী।

এরপরও কি একথা বলা যায় না যে, পাকিস্তানী ষ্টাইলে বর্তমান সরকারের ছত্র ছায়ায় পাকিস্তানীরা তাদের এদেশের বন্ধুদেরকে নিয়ে সাধারণ মুসলমানদের ধর্মানুভূতিতে আঘাত করে উত্তেজনা সৃষ্টি করে এদেশকেও পাকিস্তানের ন্যায় একটি ধর্মান্ধ দেশে পরিণত করতে চায়?

আহমদী জামা'তের বর্তমান খলীফা ১৮ই ডিসেম্বর '৯২ তারিখে বলেছিলেন, "সরকার এই ঘটনার সঙ্গে অবশ্যই জড়িত আছেন এবং সরকারই এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী"।

আসহাবে কাহাফের পাতা—আররকীম

বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তানীদের মহাসম্মেলন

বিগত ২৪শে ডিসেম্বর '৯৩ মানিক মিয়া এভিনিউতে তাহফুজে খতমে নবুওয়তের 'মহাসম্মেলন' হয়ে গেল। তাহফুজে খতমে নবুওয়ত সংগঠন সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় সরজমীনে পাকিস্তানে। মুলতান শহরে এর প্রধান কেন্দ্র অবস্থিত। এই সংগঠনের প্রধান পাকিস্তানের দীন মোহাম্মদ খান। বাংলাদেশের 'মহাসম্মেলন'এ ইনিই ছিলেন 'বড় মেহমান'।

পাকিস্তানে যেভাবে এদের সভা সম্মেলনে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউল হকের নাম ব্যবহার করা হতো এখানেও তারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির নাম প্রচার পত্রে ব্যবহার করেছে। রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস এই সম্মেলন উদ্বোধন করবেন বলে হাজার হাজার পোষ্টার সারা দেশে লাগান হয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে প্রতিবাদ, সমালোচনা প্রকাশিত হলে পর রাষ্ট্রপতির কার্যালয় থেকে বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতি এখন আর ঐ সম্মেলনে যাবেন না। কিন্তু এরপরও তাহফুজে খতমে নবুওয়তওলারা রাষ্ট্রপতির নামকে তাদের পক্ষে ব্যবহার করে গেছে। এজন্য সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ঘোষণা দেয়া হয় যে, মানিক মিয়া এভিনিউতে এই সমাবেশ হতে দেয়া হবে না। তাহফুজে খতমে নবুওয়তওলারা ষ্টেজ করতে গেলে পুলিশ তাতে বাঁধা প্রদান করে। জানা গেছে শেষ পর্যন্ত মেয়র মীর্জা আব্বাসের অনুমতিক্রমে একটি ষ্টেজ নির্মিত হয়। এই সম্মেলনে বহু মৌলবী মৌলানা এবং মাদ্রাসার ছাত্র যোগদান করে। ইত্তেফাক এই সভাটিকে 'মুসল্লি সমাবেশ' বলে উল্লেখ করেছে (২৫/১২/৯৩)। এই সভায় বাংলাদেশের বেশ কিছু খতিব, মৌলানা, পীর বক্তব্য রাখেন। বি, এন, পি, এর একজন এম, পিও বক্তব্য রাখেন। জামাতে ইসলামীর একজন এম, পি ও পেশাদার বক্তা সাঈদীও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এই সম্মেলনে তাহফুজে খতমে নবুওয়তের বাংলাদেশ শাখার প্রধান খতিব ওবায়দুল হক বলেন, শেষ নবী দাবী করে কাদিয়ানীরা কাফেরে পরিণত হয়েছে। ইসলামের বিশেষ পরিভাষা—নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, মুয়ায্যীন, আযান, মসজিদ, খলীফা, সাহাবী ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার কাদিয়ানীদের জন্য নিষিদ্ধ করতে হবে। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদ-সমূহ থেকে কাদিয়ানী কর্মকর্তাদের অবিলম্বে অপসারণ করতে হবে (ইনকিলাব ২৫/১২/৯৩)। পীর দুদু মিয়া বলেন, "এদেশে কাদিয়ানীদের কোন জামাত হবে না, কোন আজান হবে না। তাদের তথা কথিত মসজিদ, আস্তানা, বই-পুস্তক সমস্ত কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে হবে (ঐ)।

দাবীগুলি হল, সকল ধর্মের ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সাংসদরা যারা মোল্লাদের ফতওয়া প্রাপ্ত নারী নেতৃত্বে সংসদে আছেন তারা বাংলাদেশের নাগরিক আহমদীদেরকে পাকিস্তানের পার্লামেন্ট যেভাবে অমুসলমান ঘোষণা করেছে ঠিক সেইভাবে অমুসলমান ঘোষণা করবেন। ফার্সী নামায, রোযা থেকে শুরু করে আরবী খলীফা, (ওরা কিন্তু দর্জিকেও খলীফা বলে) সাহাবী অর্থাৎ সাহেব শব্দ পর্যন্ত আহমদীদের জন্য ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে। হিন্দু, খৃষ্টান, বৌদ্ধরা এই দেশের বড় বড় পদে থাকলেও কাদিয়ানীরা বড় বড় পদে থাকতে পারবে না।

সাঈদ আহমদ পালনপুরী বলেন, গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবুওয়ত চুরি করেছেন (জনকণ্ঠ, ২৫/১২/৯৩)। এই সব দাবীর মধ্যে কতখানি যুক্তি আছে তা নিয়ে আলোচনা করব না। দেশের বিবেকবান মানুষ এ নিয়ে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। দেশের বিবেকবান মানুষও জাতীয় সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখেছেন।

খবরে প্রকাশ, "যেসব বিদেশী সমাবেশে বক্তৃতা করেন তারা সবাই ছিলেন পাকিস্তানী।......জনৈক বক্তাকে তুরস্ক থেকে আগত মৌলানা বলে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলেও বিস্ময়করভাবে তিনি উর্দুতে বক্তৃতা দেন। উল্লেখ্য, সমাবেশের অধিকাংশ বক্তাই উর্দুতে বক্তৃতা দেন (আজকের কাগজ ২৫/১২/৯৩)।

বলা হয়েছে, কাবাশরীফের ইমাম নাকি নিরাপত্তার অভাবে বাংলাদেশে আসতে পারেন নি। তিনি করাচী পর্যন্ত এসে বাধাপ্রাপ্ত হন (ইনকিলাব, ২৫শে ডিসেম্বর)। পাকিস্তানী মৌলানারা বাংলাদেশে এলে তাদের নিরাপত্তার অভাব হয় না। নিরাপত্তার অভাব হয় কাবা শরীফের ইমামের। সৌদী দূতাবাস আছে ঢাকায় তারাও নিরাপত্তার ব্যাপারে অসহায় হয়ে গেল! আশ্চর্য আর কাকে বলে! অথচ এই ইমাম সাহেব ইতিপূর্বে কয়েকবারই ঢাকায় এসে বেড়িয়ে গেছেন।

সম্মেলন শেষ হয়েছে দীর্ঘ দিন পূর্বে। কিন্তু আজো পাকিস্তানী মৌলবীরা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানী ষ্টাইলে ফতওয়া বিতরণ করে ওয়াজ করে চলেছেন। নারী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ফতওয়া দানকারী জিয়াউল হকের সমর্থক মনজুর চিনিউটি '৭১ এ পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনী তথাকথিত ইসলামী মুজাহেদ'দের সাফাই গেয়েও বক্তৃতা দিচ্ছেন (আজকের, কাগজ, ১২/১/৯৪)। কিন্তু তা সত্বেও আমাদের সরকার নীরব। মঞ্জুর চিনিউটি সম্বন্ধে পাকিস্তানী পত্রিকার মন্তব্য। "মিথ্যার উপরই তার মিশন, ধোকা তার পেশা খতমে নবুওয়তের নামে চাঁদা আদায় করে নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করেছে" (দৈনিক হায়দার

(অবশিষ্টাংশ ৬২ পাতায় দেখুন)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৭০ তম সালানা জলসা

৪, ৫ ও ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪

ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সমাপ্তি ভাষণ

আশহাদু আন্‌লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আম্মা বা'দু ফাআউযুবিল্লাহে মিনাশ শাইত্বানির রাজীম। বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম।

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। আর্‌ রাহমানির রাহীম, মালেকে ইয়াউমিদ্দীন। ইয়্যা কানা'বুদু ওয়া ইয়্যা কানাসতাঈন। ইহ্‌দিনাস্‌ সিরাতাল মুস্তাকীম। সিরাতাল্লাযীনা আন্‌আমতা আলায়হিম গায়রিল মাগদুবে আলায়হিম ওলাদ্দোয়াল্লীন। আমীন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আস্‌সালামু আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর ৭০ তম সালানা জলসার সমাপ্তি ভাষণে সংক্ষেপে আমাদের কর্ম প্রচেষ্টাকে আপনাদের সামনে তুলে ধরার পূর্বে কিছু প্রয়োজনীয় কথা বলতে হচ্ছে। কুরআন পাক এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সুন্নত ও হাদীস আমাদের শিক্ষা ও আদর্শের মূল উৎস। এ সবকে মূলধন করে আমরা ব্যক্তি, পরিবার, স্থানীয় সমাজ-ব্যবস্থা ছাড়াও নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই।

এ দাবী খুবই বিশাল ও তাৎপর্যবহ। এর বিশালত্ব ও আমাদের অর্থাৎ আহমদী মুসলিম জামা'তের বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করে অনেকেই বলতে পারেন এ দাবী বাস্তবতা বর্জিত। তাই কখনও তা কার্যকর করা যাবে না। তর্কে না গিয়ে তাদেরকে বলবো অতি ক্ষুদ্র বীজেই ভবিষ্যতের বিরাট বৃক্ষ লুকিয়ে থাকে। তেমনি দেখা যায় নবী-রসূলদের আদর্শ এবং শিক্ষার মাঝেও মানবতার জন্য বিরাট সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ লুকিয়ে থাকে। উভয় ক্ষেত্রেই স্রষ্টার অমোঘ বিধান কাজ করে। তাই এসবে অবাস্তবতা দেখা যুক্তিসংগত বলে মনে হয় না।

ভূমিকাতে আরো কিছু কথা রাখতে হচ্ছে যা আমাদের কার্যক্রমকে অনুধাবন করতে সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস। আধুনিক সভ্যতাকে বিচার করতে গিয়ে একদল এতে শুধু দুর্গতি ও দুর্ভাবনা দেখতে পায়। অপরদিকে আরেকদল দেখে শুধু উন্নয়ন ও অগ্রগতি। উভয় দলকে আমরা 'এক চোখা' বা কানাও বলতে পারি। উভয়দলের সমস্যা হলো কানা চক্ষুকে সুস্থ করে তোলা। তাতে তাদের দৃষ্টিতে সমন্বয় সৃষ্টি হবে। তাদের দ্বারা মানবতা তখন সামগ্রিকভাবে উপকৃত হবে। উল্লেখ করতে হচ্ছে যে, অন্ধের সমস্যা কানার চেয়ে শোচনীয়। দৈহিক অন্ধত্বের চেয়ে অনেক বেশী ভয়াবহ অন্ধত্ব বিরাজ করছে দুনিয়ার সর্বত্র। যেমন স্বার্থান্ধ, ইজমান্ধ, ধর্মান্ধ প্রভৃতি। তন্মধ্যে

ধর্মান্ধরা অল্পতেই ক্রোধান্ধও হয়ে পড়ে, সে কথা থাক। এ ধরনের অন্ধদের জঘন্য আক্রমণে জনজীবন আজ মারাত্মকভাবে ক্ষত-বিক্ষত। এ অন্ধত্বই আবার তাদের অহংকার। অহংকার যে পতনের মূল তা তারা ইতিহাস হতে শিখে না, উপলব্ধিও করে না। এসব কারণে মানবতাহীন মানুষেরাই সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করে চলেছে।

যখনই দুনিয়াতে এমন অবাঞ্ছিত পরিবেশ সৃষ্টি হয় তখন সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী আল্লাহ্ নবী-রসূল পাঠিয়ে মানবতাহীন আদম সন্তানদেরকে মানুষ হওয়ার পথ দেখান। তাঁরা মানব জীবনে দুনিয়াবি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বাঞ্ছিত সমন্বয় ঘটান। তাতে কানা ও অন্ধরা 'চোখ' ফিরে পায়, সব রোগ-মহা-মারির উপশম ঘটে। আল্লাহ্তা'লা এ যামানাতেও হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতি নবীরূপে প্রেরণ করেছেন। তাঁর মাধ্যমে তিনি ইসলামকে পুনর্জীবিত করেছেন এবং দুনিয়াময় তা পুনর্বাসিত করার দায়িত্বভার দিয়েছেন। আমরা সে দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করলে কোন শক্তিই আমাদের অগ্রগতি রোধ করতে পারবে না। তখন অবাস্তবতার কোন কথাই থাকবে না।

সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসাঃ

এ বিষয়ে যা বিশেষভাবে অনুধাবন করতে হবে তাহলো কোন আদর্শ ও শিক্ষা যতবড় ও মহান হয় তার পিছনে ততবড় ব্যক্তিত্বের বাস্তব পরশ না থাকলে ঐ শিক্ষা ও আদর্শকে সমাজ জীবনে জীবন্ত করে তোলা যায় না, বেশীদিন ধরেও রাখা যায় না। দেখা যায় যত ঐশীগ্রন্থ নাযেল হয়েছে ওসবের সাথে নবী-রসূলদের ব্যক্তিত্বের নিবিড় সংযুক্তি রয়েছে। এও দেখা যায় নবী-রসূলগণের ইন্তেকালের পরে তাঁদের জীবনে কল্পকাহিনী স্থান দিয়ে পরবর্তী অনুসারী এবং বিরোধীরা তাঁদের ব্যক্তিত্বকে বিভ্রান্তির কারণ করে তুলে। রসূল করীম (সাঃ)-এর জীবনেও এর কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এ অবস্থা হতে মুক্তি পেতে হলে আমাদেরকে কুরআন পাক ও হুযূর (সাঃ)-এর বিশুদ্ধ জীবন পরস্পরকে পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করতেই হবে। এ জন্য আমাদেরকে রসূলে করীম (সাঃ)-এর জীবনী আলোচনার ৩টি বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ (১) জনগণের সামনে তাঁর পবিত্র জীবনে আরোপিত সব কল্পকাহিনীর অসারতা প্রমাণ, (২) কুরআন-ভিত্তিক জীবনী প্রচার ও (৩) বর্তমান যামানার সমস্যা সমাধানের জন্য ঐ জীবনী হতে সকল প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ।

১৯৯৩ সালে ২১টি জামাত হতে সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠানের সংবাদ আমরা পাক্ষিক আহমদী পত্রিকার মাধ্যমে পেয়েছি। এ ছাড়াও বিভিন্ন স্থানীয় জামাত ও ঢাকা জামাতের বিভিন্ন হালকায় সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে আমরা সন্তুষ্ট হলে চলবে না। সীরাতুন্নবী জলসাকে আরও অনেক সম্প্রসারিত করতে হবে।

মসজিদ ও মিশন ঃ

ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শকে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে বাস্তবায়নের জন্যে মসজিদ অত্যাবশ্যক। বর্তমান যামানায় ইসলাম প্রচারের দায়িত্বকে সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে হলে অফিস, লাইব্রেরী, কর্মচারীদের বাসস্থান, মেহমান খানা, তালীম-তরবীয়তের জন্যে সুবিধাদি থাকা একান্ত প্রয়োজন। এসব একই স্থানে করতে পারলে কাজ করা সহজসাধ্য হয়। এই জন্যে আমরা সীমিত সামর্থ্য নিয়েও মসজিদ ও মিশন স্থাপনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। ১৯৯৩ সালে যা করা হয়েছে সংক্ষেপে তা হলো ঃ অনুদান দেয়া হয়েছে – (ক) **মেরামতের জন্য ঃ** (১) নারায়ণগঞ্জ (২) আহমদনগর (৩) চট্টগ্রাম (৪) তেবাড়ীয়া (৫) কাফুরিয়া (৬) বিষ্ণুপুর ও (৭) খাকদান জামাত, (খ) **নির্মাণ কাজে সহায়তার জন্য ঃ** (১) তেরগাতী (২) চরসিন্দুর (সুলতানপুর) (৩) রঘুনাথপুরবাগ (সম্প্রসারণ) (৪) সৈয়দপুর (৫) বাহের চর ও (৬) খামার গেদরা জামাত।

সব মিলে অনুদান দেয়া হলো ঃ টা= ৩,৬৪,১০০/০০ মাত্র। যা গত বছরের চেয়ে টাঃ ১,১৬,৯০০/- বেশী।

সালানা জলসা ঃ

সাধারণতঃ বিভিন্ন জামাত কর্তৃক সালানা জলসাগুলো শুকনো মৌসুমে করা হয়। ১৯৯৩ সালে শুকনো তথা শীতকাল শুরু হওয়ার প্রথম থেকেই আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে সরকার কর্তৃক অমুসলমান ঘোষণা করার জন্য সারা দেশব্যাপী বিরুদ্ধবাদীদের প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। তথাপি সুন্দরবন, আহমদনগর, ভাতগাঁও, খাকদান, কুকুয়া, নারায়ণগঞ্জ, তারুয়া, নিউ সোনাতলা জামাতসমূহে সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আশা করি যথাসম্ভব শাখা জামাত সমূহ তাদের সালানা জলসা করার প্রয়াস আরো ব্যাপক ও জোরদার করবে কেননা আমাদের অগ্রগতিতে জলসার গুরুত্ব অপরিসীম। এতে একদিকে যেমন প্রচার কাজ বিস্তার লাভ করে তেমনি আমাদের সাংগঠনিক শক্তিও পরিপুষ্টি লাভ করে থাকে। তাছাড়া বয়াত গ্রহণকারীদের সংখ্যাও বেড়ে যায়।

কর্মীদল ঃ

বর্তমান ঢাকাস্থ কেন্দ্রসহ বিভিন্ন জামাতে ৮ জন সদর মুরব্বী ও ২৮ জন মোয়াল্লেম কর্মরত আছেন। তাছাড়া ১৩ জনকে মোয়াল্লেম করার জন্য ৬ মাসের প্রশিক্ষণ কোর্সে নেয়া হয়েছে। নবদীক্ষিতদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার দরুন মোয়াল্লেমের প্রয়োজন তীব্রতর হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই সংখ্যা খুবই অপ্রতুল। আমাদের সীমাবদ্ধতার দরুন এই সংখ্যা বর্ধিত করাও সহজ নয়। আমরা যদি নারী-পুরুষ সবাই সাধ্যমত তালীম, তরবীয়ত ও তবলীগের কাজে বিশেষ করে ওয়াকফে আরযীতে নিজেদেরকে নিয়োজিত করি তবে এই অভাব অনেকখানি পূরণ হবে এবং এই দায়িত্ব পালন দ্বারা আমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিও লাভ করবো।

তাহরীকে ওয়াক্‌ফে নও (নব উৎসর্গের ঘোষণা) ঃ

আমাদের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) ইসলামের আদর্শে অবক্ষয়মুক্ত নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাহরীকে ওয়াক্‌ফে নও জারি করেছেন।

ইহা মানব কল্যাণে একটি অনন্য-সাধারণ পরিকল্পনা। এতে সন্তান মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই পিতা-মাতা সন্তানকে ইসলামের জন্যে উৎসর্গ করে দেন। তাদেরকে ইসলামের নিঃস্বার্থ সেবার জন্যে বিশেষ যত্ন সহকারে লালন-পালন ও শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ১৩৫ জন ওয়াক্‌ফে নও রেকর্ডভুক্ত হয়েছে। তাদের দেখা শুনার জন্যে ৩৪ জন স্থানীয় সুপারভাইজর নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সার্কুলার ও পাক্ষিক আহমদী মারফত অবহিত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে "তাহরীকে ওয়াক্‌ফে নও ও হামারী জিম্মাদারীয়াঁ" বাংলা তরজমা সুপারভাইজর ও পিতা-মাতাদের নিকট প্রেরিত হয়েছে। তাদেরকে পিতা-মাতার সাথে ও কাজের অগ্রগতি নিয়ে কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, হুযূর (আইঃ) 'ওয়াকফে নও' এ শামীল হওয়ার মেয়াদ আরো বৃদ্ধি করার কারণে আল্লাহতা'লার ফযলে বাংলাদেশ হতে আরো অনেক আবেদন হুযূরের নিকট প্রেরণ করা হচ্ছে। এ সব আবেদন গৃহিত হয়ে আসলে আমাদের ওয়াকফে নও-এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাবে। ইতিমধ্যে হুযূর (আইঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক ওয়াকফে নওদের সর্বাঙ্গীন তালীম তরবীয়ত ও সুন্দর জীবন যাপনের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সাব-কমিটির মাধ্যমে কাজ করা হচ্ছে, যেমন-বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার জন্য Teaching of different languages Sub-Committee ও তাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবন সম্পর্কে নির্দেশনা দান করার জন্য Career Planing Sub-Committee গঠন করা হয়েছে। হুযূর (আইঃ)-এর নির্দেশনা মোতাবেক আমরা কাজ করতে পারলে এ নবাগত মুজাহিদগণ দুনিয়ায় এক নতুন বিপ্লব আনতে সক্ষম হবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

এ ছাড়া 'ওয়াকফে নও' শিশুদের পিতা-মাতার পথ নির্দেশনাস্বরূপ কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত উর্দু পুস্তক 'ওয়াকেফীনে নও কে ওয়ালেদাইন কে রাহ্‌নুমাইকে লিয়ে' পুস্তক খানার বাংলা তরজমা পাক্ষিক আহমদীতে

প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তিকাকারেও তা আপনাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে। ওয়াকেফীনে নও শিশুদেরকে জন্মের পূর্ব থেকে এবং জন্মের পরে স্কুলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সময়ে কীভাবে গড়ে তুলতে হবে সে সম্বন্ধে এ পুস্তিকায় সুন্দরভাবে পথ নির্দেশনা ব্যক্ত করা হয়েছে। পুস্তিকাখানা প্রনয়ন করেছেন খুরশীদ আতা সাহেবা আর বাংলায় অনুবাদ করেছেন মোহাম্মদ মুতিউর রহমান সাহেব।

প্রকাশনা ঃ

বর্তমান যামানাকে "কলমের যুগ" বললে বোধ হয় ভুল হবে না। এমন দেশ বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে দেশ হতে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকাদি প্রকাশিত না হয়। এ সবের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। তাছাড়া প্রচুর বই-পুস্তকও প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের মত ক্ষুদ্র দেশ হতেও ঢাকা এবং অন্যান্য শহর থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা শতাধিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকাদির সংখ্যা চারি শতাধিক। এ সম্পর্কে যে বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাহলো জ্ঞান শুধু কল্যাণ নয় অকল্যাণেরও উৎস হয়ে থাকে। এ যামানায় বিশ্বব্যাপী চরম অবক্ষয়ের একটি বড় কারণ হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচুর অপব্যবহার। চতুর্দিকে তাকালেই দেখা যায় আমরা যেন অশ্লীল পত্র-পত্রিকা, পুস্তকাদি ও ছবিতে ঢাকা পড়ে আছি। এই অবস্থা হতে মুক্তি পেতে হলে (মুক্তি আমাদের পেতেই হবে) মানুষকে ব্যাপকভাবে 'পবিত্রকরণ প্রক্রিয়া' সংক্রান্ত জ্ঞানে জ্ঞানবান করতে হবে। এই মহান দায়িত্ব সুসম্পন্ন করার জন্যে আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে ইমাম মাহদী ও প্রতিশ্রুতি মসীহ্‌রূপে প্রেরণ করেছেন। ইসলামের এই একনিষ্ঠ সেবককে আল্লাহ্‌ 'সুলতানুল কলম' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তাই আমাদের প্রচারের কাজে কলম তথা পাবলিকেশনের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে এবং দেয়া হচ্ছেও।

উল্লেখ্য যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে দেশে যে নানাভাবে জঘন্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অপপ্রচার চালানো হচ্ছে-এর বাহনও পুস্তক-পুস্তিকা, বুলেটিনাদি। এ সবের জবাবস্বরূপও আমাদেরকে বই-বুলেটিনাদি প্রকাশ করতে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে পাক্ষিক আহমদী ছাড়া অন্যান্য প্রকাশনার তালিকা দেয়া হলো ঃ-

পুস্তক-পুস্তিকা ঃ

১। পয়গামে সোলেহ, ২। ওয়াক্‌ফে নও, ৩। আমাদের শিক্ষা, ৪। মহাসুসংবাদ, ৫। পয়গাম, ৬। মাহ্‌যার নামা, ৭। জীবন্ত খোদার জলন্ত নিদর্শন, ৮। মুসলিমের দৃষ্টিতে কৃষ্ণ, ৯। আহ্‌বান, ১০। দাজ্জাল ও তাহার গাধা, ১১। নবীনেতা মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ), ১২। কিশ্‌তিয়ে নূহ, ১৩। ওফাতে ঈসা (আঃ), ১৪। খাতামান্নবীঈন (সাঃ), ১৫। জমা' নামায, ১৬। ইসলামী নীতি দর্শন।

ফোল্ডার ঃ

১। বয়াত ফরম, ২। ভেবে দেখা দরকার, ৩। শুভ সংবাদ ও আমন্ত্রণ, ৪। সতর্কবাণী, ৫। অমুসলিম ঘোষণার অইসলামীক দাবী, ৬। সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, ৭। মসজিদ মন্দির ও উপাসনালয়, ৮। মোমেনকে ধৈর্যশীল হতে হবে, ৯। আমাদের ধর্ম বিশ্বাস, ১০। মিথ্যা অপপ্রচার কোরান বিরোধী কাজ, ১১। আহমদীয়া মুসলিম জামাত ও ডিস এন্টেনা, ১২। প্রিয় মাতৃভূমির ভাইবোনদের নিকট, ১৩। সত্যকে জানুন ও মানুন, ১৪। ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সাক্ষাৎকার, ১৫। সম্মেলন মহাসম্মেলনের মহান শিক্ষা।

মোহতারম মোহাম্মদ ইয়ামীন সাহেব যে-সব পুস্তক অনুদান হিসেবে দিয়েছেন ঃ-

(1) Garden of the Rightious

(2) Muhammad Seal of the Prophets

(3) The Philosophy of the Teachings of Islam

(4) Invitation to Ahmadiyyat

মোহতারম আলহাজ্জ আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব 'মুসলিমের দৃষ্টিতে কৃষ্ণ' বইটি অনুদান হিসেবে জামাতকে প্রদান করেন।

মোহতারম শাহ্ মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব 'ঈসা (আঃ)-এর মৃত্যুতে ইসলামের জীবন' বইটি জামাতকে অনুদান হিসেবে প্রদান করেছেন।

মোহতারম মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব 'ইসলামী দোয়া' বইটি নিজ খরচায় ছাপিয়ে জামাতকে প্রদান করেছেন।

তাছাড়াও যাদের কাছ থেকে বই-পুস্তকাদি পেয়েছি তাদের নাম উল্লেখ না থাকলেও দোয়াতে তাদেরকেও শামীল রাখা হবে।

প্রদর্শনী ঃ

শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে বিভিন্ন দেশে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক প্রদর্শনী খোলা হয়। এ সবের মাধ্যমে বিশ্ব-ব্যাপী এ জামাতের কার্যক্রমকে অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়। বাংলাদেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও আহমদনগরে প্রদর্শনী খোলা হয়। বিভিন্ন দেশে যে-সব প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় তন্মধ্যে ঢাকার প্রদর্শনী একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিল। বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, ২৯শে অক্টোবরে (১৯৯২) আহমদীয়া কমপ্লেক্সে যে-জঘন্য হামলা হয় তা হতে প্রদর্শনীটিও রক্ষা পায়নি। এতে রক্ষিত অন্যূন ৫৪টি ভাষার কুরআন শরীফ (আরবী তরজমা ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা) ও অন্যান্য আরও বহু গুণী জনের তরজমা ও ব্যাখাসহ বহু প্রদর্শনযোগ্য মূল্যবান বই- পুস্তক, ছবি ইত্যাদি পুড়ে ফেলা হয়। দুঃখের বিষয় যে, আমরা এখনও ঢাকাতে প্রদর্শনী নতুন করে গড়ে তুলতে পারিনি। যথাসত্বর এ কাজ সম্পন্ন করার প্রয়াস নেয়া হচ্ছে। আমাদের অন্যান্য স্থানে স্থাপিত প্রদর্শনীসমূহ ১৯৯৩ সালে যারা দেখেছেন তাদের সম্পর্কে কিছু পরিসংখ্যান দেয়া হলো - আহমদনগর জমাতের দর্শনার্থি ছিল এবার প্রায় ২০০ জন। তাদের অধিকাংশই উচ্চস্তরের লোক। চট্টগ্রাম জামাতে এবছর দর্শকদের সংখ্যা - ৫৬১ জন, তবে অনিবার্য কারণে অধিকাংশ সময়ই প্রদর্শনী বন্ধ রাখতে হয়েছে, বর্তমানেও মসজিদের কাজের জন্যে প্রদর্শনী বন্ধ। খুলনা জামাতের প্রদর্শনী বিরুদ্ধবাদীগণ কর্তৃক নষ্ট হওয়ার পর পুনরায় সাজানো সম্ভব হয়নি, তবে চেষ্টা চলছে।

সম সাময়িক পত্র-পত্রিকায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত ঃ

অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর যেজন্য আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ পত্র-পত্রিকায় অনেক ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে এর প্রধান কারণ হলো বিরোধীদের পক্ষ হতে আহমদীয়া মুসলিম জামাত'কে অমুসলিম ঘোষণার দাবীতে দেশব্যাপী প্রবল আন্দোলন। "আন্তর্জাতিক তাহাফ্‌ফুজে খতমে নবুওয়ত" ২৪শে ডিসেম্বর (১৯৯৩) মানিক মিয়া এভিনিউতে মহাসম্মেলন আহ্বান করে। এই সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য তারা দেশের আনাচে কানাচে বিভিন্নস্তরে সম্মেলন করতে থাকে। এজন্য হাজার হাজার প্রচার-পত্র বিলি করে। দেয়ালে দেয়ালে চিকা মারে। মিসিল করে, শ্লোগান দেয়। তারা টাকাতে সীল মেরে 'কাদিয়ানীরা কাফের' প্রচার করে, তারা এও বলে যে, তাদের দেয়া নির্দ্ধারিত সময়ে কাদিয়ানীদের অমুসলমান বলে ঘোষণা না করলে সরকারকেই 'কাদিয়ানী' সরকার বলে ঘোষণা করা হবে। তারা মসজিদে মসজিদেও মিথ্যা ও বিরামহীন অপপ্রচার চালায়। এভাবে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিরুদ্ধে এক জঙ্গী উম্মাদনা সৃষ্টি করে। তখন কোন কোন পত্র-পত্রিকায় এ সবের বিরুদ্ধে কিছু কিছু সমালোচনা চলে। ১৯শে ডিসেম্বর (৯৩) আমরা আমাদের প্রধান কার্যালয়ে একটি প্রেস কনফারেন্স ডেকে এই আন্দোলনের পিছনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করি। তৎপর পত্র-পত্রিকাদিতে ব্যাপকভাবে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে তীব্র হতে তীব্রতর সমালোচনা হতে থাকে। সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, প্রবন্ধাদি ও

চিঠিপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। এখনও তা বেশ জোরে শোরেই চলছে। উল্লেখ্য যে, যে কয়েকটি মৌলবাদী পত্র-পত্রিকা আমাদের চরম বিরোধিতা করে থাকে তারাও বসে নেই এবং তারাও সাধ্যমত তাদের কথা বলে যাচ্ছে। উভয় পক্ষের দরুনই আমাদের সম্বন্ধে জানার আগ্রহ দেশের সর্বত্র অনেকগুণে বেড়ে গেছে। তাতে আল্লাহ্‌র ফযলে আমাদের প্রচারের সুযোগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বয়াতের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। বিরোধীদের অপপ্রচার কত হীনতর হতে পারে তা ভাবতেও অবাক লাগে। যেসব পত্রিকা সরকার কর্তৃক কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণার দাবীকে অযৌক্তিক, অসাংবিধানিক বলে জোরালোভাবে বক্তব্য পেশ করছে ওসবের মালিকানা নাকি ইহুদিদের টাকায় আমরা কিনে নিয়েছি। মজার কথা হলো-ওসব প্রবন্ধে প্রদত্ত যুক্তি খন্ডনে তারা ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। নতুবা আহমদীয়া মুসলিম জমাত সম্পর্কে জানার কৌতুহল বেড়ে যাচ্ছে কেন।

ইসলাহ-ও-ইরশাদ বিভাগ ঃ

১৯৯৩ সালে ২০৬৫ জন ভ্রাতা-ভগ্নী বয়াত গ্রহণ করেছেন। হুযুর (আইঃ)-এর তাহরীকালীন সময়ে অর্থাৎ এপ্রিল '৯৩ হতে জুলাই '৯৩ সময়ে ১৮০০ জন বয়াত গ্রহণ করেছেন।

হুযূর (আইঃ)-এর তাহরীক অনুযায়ী নতুন বয়াতকারীদের জন্য ১লা সেপ্টেম্বর '৯৩ হতে ৩০শে নভেম্বর '৯৩ইং পর্যন্ত ৩ মাস ব্যাপী বিশেষ তালীম-তরবীয়তী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এতদুদ্দ্যেশে সমগ্র বাংলাদেশকে ৯টি জোনে বিভক্ত করা হয়। এই ৯টি জোনের আওতায় মোট ৩৭টি স্থানে ৭০৪ জন নতুন আহমদী ভ্রাতাকে পূর্ব প্রণীত সিলেবাস অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তদুপরি কেন্দ্রীয়ভাবে ঢাকায় ২২ থেকে ২৬শে নভেম্বর ১৯৯৩ইং সময়ে ৫ দিন ব্যাপী বিভিন্ন জোন হতে আগত ১২০ জন নতুন আহমদী ভ্রাতাকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আশা করা যাচ্ছে এই নতুন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভাইয়েরা নিজেদের এলাকায় 'দায়ী ইলাল্লাহ্‌রূপে' কাজ করবেন। রিপোর্ট পাওয়া গেছে যে, তারা ইতিমধ্যেই দায়ী ইলাল্লাহরূপে কাজ করছেন। বিশেষ তালীম তরবীয়তী কর্মসূচীর অধীনে নামায, দোয়া, মালী কুরবানী, আহমদীয়া জামাতের উদ্দেশ্য, খেলাফতের বরকত, কুরআন মজীদের নির্ধারিত আয়াত, নির্বাচিত হাদীস, আহমদীয়া নেযাম, তবলীগি কাজে কথা, লেখা ও আচার-আচরণের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। সমাজের প্রচলিত বেদাতসমূহ সম্পর্কেও অবহিত করা হয়।

যে কথাটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে তা হলো, ইতিপূর্বে এরূপ ব্যাপকহারে বয়াত হয়নি, এরূপ প্রোগ্রামও করা হয়নি। তাই এক্ষেত্রে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হলো। যেভাবে বয়াতের হার বেড়ে যাচ্ছে তাতে ইন্‌শাআল্লাহ আগামীতে তালীম-তরবীয়তী কর্মসূচীকে আরো জোরদার করতে হবে।

প্রসংগতঃ উল্লেখ করা যায় যে, তবলীগের মাধ্যমে অআহমদী ও অমুসলিম ভাইদেরকে আহমদীয়া মুসলিম জামাতভুক্ত করা আমাদের জন্য যে গুরুত্ব বহন করে তেমনি আগত ভাই-বোনদেরকে সঠিক তালীম-তরবীয়ত দেয়াকেও সমভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। তা না হলে তারা দুর্বল থেকে যাবে এবং এই দুর্বলতা সমগ্র জামাতের জন্য ক্ষতিকর হবে। প্রাথমিক যুগে দেখা যায় যখন লোক দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেছিল তখন প্রয়োজনীয় তালীম-তরবীয়তের অভাবে তারাই ইসলামের জন্য অনেক সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমাদেরকে সদা সতর্ক ও সক্রিয় থাকতে হবে যাতে তবলীগ ও তালীম-তরবীয়তের মধ্যে সমন্বয় সুরক্ষিত হয়। উল্লেখ্য যে, হুযুর (আইঃ) তালীম-তরবীয়ত সংক্রান্ত আমাদের কর্মসূচীকে পসন্দ করেছেন। তিনি বিভিন্ন দেশে অনুরূপ কর্মসূচী বা সম্ভব হলে এর চেয়ে ভাল কর্মসূচী গ্রহণ করতে বলেন, আলহামদুলিল্লাহ্‌।

রিশ্‌তানাতা বিভাগ ঃ

১৯৯৩ সালে বিয়ের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে ৭২টি, বিয়ে হয়েছে ৩৮টি। ১৯৯২ সনের প্রস্তাবসহ আমাদের কাছে এ পর্যন্ত প্রস্তাব রয়েছে ৬০টি। এই প্রস্তাবগুলো কার্যকর করার জন্য তাগিদ পত্রও দেয়া হয়েছে। পর পর ২টি সার্কুলার দেয়া সত্ত্বেও স্থানীয় জামাত থেকে তেমন কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। সময় মত স্থানীয় জামাতসমূহ

থেকে পত্রের জবাব না পাওয়ায় আমাদের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। শাদী বিয়ের সমস্যাদি সমাধান করতে হলে আমাদের প্রত্যেককেই শুধু পারিবারিক ভিত্তিতে বিষয়টিকে বিবেচনা করলে চলবে না। সমগ্র জামাতের কথা ভাবতে হবে। সাথে সাথে সক্রিয়ও হতে হবে। এসব বিষয়াদিকে শুধু লেখা-লেখিতে আবদ্ধ রাখলেও হবে না, সাধ্যমত আলাপ-আলোচনার মধ্যে আসতে হবে।

অডিও ভিডিও বিভাগ ঃ

১৯৯৩ ছিল জামাতে আহমদীয়া বাংলাদেশের বিরোধিতার বছর। এটি দুনিয়াবী সংগঠন হলে ১৯৯৩ সনেই এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যেত। কিন্তু আমাদের কার্যক্রম থেমে থাকেনি। ১৯৯৩ সনে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ ডিশ এন্টেনা/স্যাটেলাইটের মাধ্যমে নিজস্বভাবে প্রচারনার যুগে পা রাখে। আমরা বিগত বছরে ঢাকা, আহমদনগর, তারুয়া ও চট্টগ্রামে ডিশ এন্টেনা লাগিয়ে স্যাটলাইটের মাধ্যমে হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)-এর খুতবা জুমুআ সরাসরি দেখছি। প্রতি সপ্তাহে ৫ শতাধিক লোক যামানার খলীফাকে দেখে ও তাঁর কথা শুনে প্রাণবন্ত হয়ে উঠে। আমরা বাংলাদেশে জামাতী ও ব্যক্তিগতভাবে ডিশ এন্টেনার দ্বারা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শকে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছি।

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার তারুয়া গ্রামে স্থাপিত ডিশ এন্টেনা নিয়ে আমাদের বিরুদ্ধবাদী একটি স্বার্থান্বেষী মহল ডিশ এন্টেনার মাধ্যমে আমরা ব্লু ফিল্ম দেখি-এ অভিযোগে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ফৌজদারী মামলা দায়ের করে। মাননীয় থানা ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় বিরুদ্ধবাদীদের এ মিথ্যা অভিযোগ গ্রহণ করে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে তারুয়া জামাতের 'মসজিদে বাশারত' থেকে ডিশ এন্টেনা নামিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। আমরা পরদিনই ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলা জজ মহোদয়ের কোর্টে এ নির্দেশের বিরুদ্ধে আপীল মোশন করি। উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর মাননীয় জেলা জজ (অতিরিক্ত) মহোদয় নিম্ন আদালতের ডিশ এন্টেনা নামিয়ে ফেলার নির্দেশটি রদ করেন ও ইহা আইন বহির্ভূত বলিয়া রায় প্রদান করেন। যারা এ মোকদ্দমা পরিচালনার ব্যাপারে কায়িক, মানসিক ও বুদ্ধিভিত্তিক সাহায্য প্রদান করেছেন- আমরা আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে তাদের সর্বাংগীন মংগল কামনা করি।

নিম্নে অডিও ভিডিও বিভাগের কার্যক্রমের তফসীল প্রদান করা হলো ঃ

(ক)	ফেরত দেয়ার ভিত্তিতে বিতরণকৃত ভিডিও ক্যাসেট -	১৮৪ টি
(খ)	" " " অডিও ক্যাসেট -	৩৮৬ টি
(গ)	বিভিন্ন জামাতে প্রেরিত খুতবার অডিও ক্যাসেট -	৫৫ টি
(ঘ)	সদর মুরব্বী সাহেবানদের প্রদত্ত অডিও ক্যাসেট -	৪২ টি
(ঙ)	গত সালানা জলসা থেকে শুরু করে এ যাবৎ জামাতী কার্যক্রমের অডিও ও ভিডিও রেকর্ডিংকৃত অনুষ্ঠান (প্রেস কনফারেন্সসহ)	১৩ টি

এ ছাড়া ডিশ এন্টেনা সংক্রান্ত ব্যাপারে দু'টি (তারুয়া ও ঢাকায়) প্রেস কনফারেন্স ও বিভিন্ন লিফলেট প্রকাশ করা হয়।

বিগত বছরের শেষাংশে সারাবিশ্বের Muslim TV Ahmadiyya এর ব্যবস্থাপনায় যে ১২ ঘন্টার প্রোগ্রাম প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে- তাতে বাংলা ভাষায় এক ঘন্টার অনুষ্ঠান প্রচার হচ্ছে মাশাআল্লাহ্। নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বাংলা প্রোগ্রামের ক্যাসেট হুযূরের (আইঃ)-এর খেদমতে পাঠিয়েছি। হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ) ৭ই জানুয়ারী, ১৯৯৪ তারিখের খুতবায় বলেছেন যে, সারা বিশ্বের মধ্যে প্রথম বাংলাদেশ বাংলা প্রোগ্রামের ক্যাসেট পাঠিয়েছে। আমাদের অনেক দুর্বলতা রয়েছে। তথাপি আমরা পৃথিবীর বাংলা ভাষা-

ভাষি ভাই-বোনদের জন্য উপাদান তৈরী করার চেষ্টা করছি। আমাদের ভিডিও ক্যামেরা ছিল অতি পুরোনো। ইতিমধ্যে জামাতকে জনাব বশীর উদ্দিন আফজাল আহমদ খান চৌধুরী একটি নতুন ভিডিও ক্যামেরা এবং জনাব এ, কে, এম, ফারুক তাঁর নিজের ভিডিও ক্যামেরা দান করে এই বিভাগকে সমৃদ্ধ করেছেন। উভয়ের জন্য ও তাদের পরিবারবর্গের দীনি ও দুনিয়াবী মংগলের জন্য দোয়া করার আবেদন রাখছি। উল্লেখ্য যে, ডিশ এন্টেনা তৈরী ও ব্যবহার শিক্ষা দেয়ার জন্য আমরা একটি ট্রেনিং প্রোগ্রাম কার্যকর করেছি। এই রকম প্রোগ্রাম সমগ্র বাংলাদেশে প্রথম করা হলো- আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করুন- তাঁর দরবারে এ আকুতি রাখছি।

অংগ সংগঠনসমূহ ঃ

এ ভাষণের শুরুর দিকেই বলা হয়েছে যে, ঐশি বিধান মতো আহমদীয়া মুসলিম জামাতে খেলাফত-ব্যবস্থা কায়েম আছে। এই ফেলাফতের মাধ্যমে এ জামাত বিভিন্ন স্তরে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় পরিচালিত হচ্ছে। এই জামাতের রয়েছে আনসারুল্লাহ (৪০ অনূর্ধ বয়সের পুরুষের সংগঠন), লাজনা ইমাইল্লাহ (বয়স্ক মহিলা সংগঠন), খোদ্দামুল আহমদীয়া অর্থাৎ যুবকদের সংগঠন, (১৫ - ৪০ বৎসর বয়স্ক পুরুষদের সংগঠন), তাছাড়াও রয়েছে ছোটদের সংগঠন - আতফালুল আহমদীয়া ও নাসেরাতুল আহমদীয়া। বিভিন্ন সংগঠন যেমন নিজস্ব কার্যসূচী বাস্তবায়ন করে থাকে তেমনি সম্মিলিতভাবেও অনেক কাজ সমাধা করে থাকে। এখন বিভিন্ন সংগঠনের নিজস্ব কার্যক্রম সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন পেশ করা হচ্ছে ঃ

মজলিসে আনসারুল্লাহ সিলসিলা আলীয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ঃ

মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌ সিলসিলা আলীয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ নিজেদের কর্ম প্রচেষ্টাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশকে ৬১টি স্থানীয়, ১৯ টি জিলা এবং ৪টি বিভাগীয় মজলিসে বিভক্ত করেছে। ১৯৯৩ সনে মজলিসে আমেলার ১৭ টি সভা করা হয়েছে। হুযূর (আইঃ)-এর অনুমোদনক্রমে ৮ম তালীমুল কুরআন ক্লাস ও ১৬ তম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তালীমুল কুরআন ক্লাসে ৪৯টি মজলিস থেকে ৬৩ জন আনসার শিক্ষা গ্রহণের জন্য যোগদান করেন এবং বার্ষিক ইজতেমায় ৫০টি মজলিস হতে ১৮৪ জন আনসার উপস্থিত হন। ১৯৯৩ সালে চল্লিশোর্দ্ধ ২০৮ জন নূতন ভাই বয়াত গ্রহণ করেন। এ বৎসর মোট ১১ টি স্থানীয় মজলিসে বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মজলিসের কেন্দ্রীয় আমেলার সদস্যগণ মোট ৩৩টি মজলিস পরিদর্শন করেছেন। মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র সদস্যগণের তবলীগে বয়াত গ্রহণ করেছে ২০৮ জন। তদুপরি ১৯৯৩ সনে আমাদের বিশিষ্ট আনসার জনাব ডাঃ আবদুল আজীজের তবলীগে বয়াত হয়েছে ৩০০ জন।

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌ ১৯৯৩ সনে নূতন আঙ্গীকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক শূরা করেছে এবং 'আনসারুল্লাহ্‌ বার্তা' নামে একটি ত্রৈমাসিক মুখপত্র প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খেদমতে খালক ফান্ড হতে বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌ ১৯৯৩ সালে সাহায্য বাবদ ১১,০০০/= টাকা ব্যয় করেছে।

লাজনা ইমাইল্লাহ্‌ বাংলাদেশ ঃ

বর্তমানে বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ৫৫টি শাখা সংগঠন কায়েম আছে। ৮ই আগষ্ট, ১৯৯৩ তারিখে মোহতারম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের অনুমতিক্রমে বাংলাদেশের সকল স্থানীয় জামাতে সার্কুলার দেয়া হয় যে, যেখানে লাজনা সংগঠন কায়েম হয়নি, সে-সব জামাতগুলোতে লাজনা সংগঠন কায়েম করার জন্য। এই প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত লাজনা সংগঠন কায়েম হয়েছে- আলহামদুলিল্লাহ্‌ ঃ (১) সুনামগঞ্জ (২) কটিয়াদী (৩) হেলেঞ্চাকুড়ি (৪) মহিনন্দ (৫) নরসিংদী (৬) তেরগাতী (৭) লালমনির হাট ও (৮) ধানীখোলা।

ইজতেমা ঃ এই বৎসর (১৯৯৩ সনে) নিম্নলিখিত লাজনা সংগঠনসমূহে ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। খুলনা, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সুন্দরবন, ঢাকা বিভাগীয় ইজতেমা (নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা তেজগাঁ ও মীরপুর মিলে) ও আহমদনগর।

বয়াত ঃ ১৯৯৩ সনে মোট ৪০৮ জন মহিলা বয়াত গ্রহণ করেন (কুমিল্লা - ৩৭৩ জন, সুন্দরবন - ৮ জন, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া- ৭ জন, চট্টগ্রাম - ৩ জন, দোহান্ডা - ১ জন, ঢাকা- ২ জন, গাজীপুর - ১০ জন ও মীরপুর - ৪ জন)।

খেদমতে খালক ঃ বাংলাদেশের লাজনার সদস্যাগণ প্রয়োজন অনুযায়ী টাকা ও ওষুদ পত্রের দ্বারা সাহায্য করে থাকেন।

বসনিয়া ফান্ড ঃ বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে টা= ২০,০০০/- (কুড়ি হাজার) টাকা বসনিয়া ফাণ্ডে অনুদান দেয়া হয়েছে।

মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ ঃ

[গত ২১, ২২ ও ২৩ অক্টোবর '৯৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশ এর ২২ তম কেন্দ্রীয় বার্ষিক ইজতেমায় ম. খো. আ., বাংলাদেশ-এর মোতামাদ জনাব কে. এম. মাহমুদুল হাসান (বর্তমানে সদর) কর্তৃক পঠিত ১৯৯২-৯৩ সালের বার্ষিক রিপোর্টের ভিত্তিতে।]

(১) মজলিস রিপোর্ট ঃ সঠিক সময়ে রিপোর্ট প্রেরণ করা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। কিন্তু অনেকগুলো মজলিস এ দায়িত্ব পালনে মনযোগী নন। যে-সব মজলিস নিয়মিত রিপোর্ট প্রেরণ করে থাকেন তাদের মধ্যে রয়েছে ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ক্রোড়া, ঘাটুরা, চাঁদপুর চা বাগান, চট্টগ্রাম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আহমদনগর, ভাতগাঁও, সৈয়দপুর, পাক্‌শী, নাসেরাবাদ, সুন্দরবন ও খুলনা মজলিস। বিশেষভাবে সক্রিয় মজলিসসমূহের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে, এসব মজলিসের কথা উল্লেখ করতে হলো।

(২) কর্মশালা ঃ গত ২৭/১১/৯২ইং তারিখে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, রিজিওনাল মজলিসসমূহও এ বছর তাদের নিজ নিজ কর্মশালা সম্পন্ন করে। এসব কর্মশালা স্থানীয় মজলিসসূহের খুবই উপকারে এসেছে।

(৩) মজলিস পরিদর্শন ঃ এ বৎসর বিভিন্ন সময়ে কায়েদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য মোহতামীমগণ স্থানীয় মজলিসসমূহে গমন করেন এবং কায়েদ নির্বাচন সম্পন্ন করেন। তাছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে মোহতামীমগণ স্থানীয় মজলিসসমূহও সফর ও অডিট সম্পন্ন করেন।

(৪) তালীম ও তরবীয়ত ঃ এ বছর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া বাংলাদেশ ২৬শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১২ই মার্চ '৯৩ পর্যন্ত ১৫ দিন ব্যাপী কেন্দ্রীয়ভাবে তালীম-তরবীয়তি ক্লাস করে। তাছাড়া ফেব্রুয়ারী এবং আগষ্ট মাসে সকল স্থানীয় মজলিসে কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে মাসিক কিতাব ও সাধারণ জ্ঞানের উপর দু'টি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এই বিভাগের অধীনে জানুয়ারী মাসে সারাদেশব্যাপী শিক্ষা সপ্তাহ পালন করা হয়।

(৫) ইজতেমা ঃ অধিকাংশ মজলিস কেন্দ্রীয় প্রোগ্রাম অনুযায়ী স্থানীয় ইজতেমা সম্পন্ন করে এবং রাজশাহী, রিজিওনাল মজলিস ২৭ ও ২৮শে আগষ্ট এবং খুলনা রিজিওনাল মজলিস ২৬ ও ২৭শে আগষ্ট '৯৩ তারিখে রিজিওনাল ইজতেমা সম্পন্ন করে।

(৬) ওয়াকারে আমল ঃ ২১-২৭শে মে '৯৩ পর্যন্ত দেশব্যাপী ওয়াকারে আমল সপ্তাহ পালন করা হয়। উক্ত সময়ে কেন্দ্রের মোহতামীমগণ বিভিন্ন স্থানীয় মজলিসে উপস্থিত থেকে ওয়াকারে আমল কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ

করেন। আমাদের গৃহীত ওয়াকারে আমল সংক্রান্ত সংবাদ চট্টগ্রামের দৈনিক আজাদী, দৈনিক পূর্বকোণ ও ডেলি লাইফ পত্রিকায় এবং ঢাকায় ইত্তেফাক, বগুড়ার দৈনিক করতোয়াসহ রেডিও বাংলাদেশের রংপুর ও চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছে।

(৭) **এশায়াত** ঃ আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে একটি ডেস্ক কেলেন্ডার প্রকাশ করা হয়। মাসিক মুখপত্র আহ্‌বানও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। কতিপয় স্থানীয় মজলিস স্ব স্ব দেয়ালিকাও প্রকাশ করেছে। এদের মধ্যে রয়েছে ক্রোড়া, বি. বাড়িয়া, চাঁদপুর চা বাগান, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ঘাটুরা, বগুড়া, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা মসলিস।

(৮) **খেদমতে খালক** ঃ কেন্দ্রের প্রোগ্রাম অনুযায়ী এ বছর ২৩ - ২৯ এপ্রিল '৯৩ তারিখে স্থানীয় মজলিসসমূহ খেদ্‌মতে খালকের বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে। অনেক মজলিস রক্তদান কর্মসূচীর আয়োজন করেছে। তার মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সৈয়দপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি মজলিসের নাম উল্লেখযোগ্য। এসব মজলিসের পক্ষ থেকে কাপড়, চিকিৎসা সামগ্রী ও জুতো/ সেন্ডেল সহ বিভিন্ন দ্রব্যাদি দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

(৯) **বিশেষ সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা** ঃ গত ৮ অক্টোবর '৯৩ তারিখে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, বাংলাদেশের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এক সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্মের প্রতিনিধিগণ মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। উক্ত খবর বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

(১০) **তবলীগ** ঃ হুযূর (আইঃ)-এর নির্দেশে রাবেতা কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির মাধ্যমে আমাদের খোদ্দামগণ রাজনৈতিক নেতা, সংসদ সদস্য এবং পেশাজীবী ও বুদ্ধিজীবীসহ সমাজের বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের কাছে আহমদীয়ত তথা সত্যিকার ইসলামকে তুলে ধরেন। হুযূর (আইঃ)-এর বিশেষ 'তবলীগে খাস' প্রোগ্রাম এ বছর আমাদের কেন্দ্রীয় মোহতামীমগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গমন করেন এবং এ কাজকে সাফল্যমন্ডিত করেন। এ ব্যাপারে অগ্রগামী মজলিসসমূহের মধ্যে রয়েছে কুমিল্লা, সৈয়দপুর, নীলফামারী, রঘুনাথপুর বাগ, ঢাকা ও গাজীপুর মজলিস। নীলফামারী ও সৈয়দপুরের খাদেমরা সদর মুরব্বী মৌঃ বশীরুর রহমান সাহেবের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘ প্রচেষ্টায় চড়াইখোলা নামকস্থানে একটি মজলিস কায়েম করতে সক্ষম হয়েছেন। ব্যক্তিগতভাবে তবলীগি তৎপরতায় যারা এ বছর বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন, সর্বজনাব উমর আলী, জেলা কায়েদ রংপুর, কে, এম, মাহবুবুল ইসলাম, রিজিওনাল কায়েদ রাজশাহী শামসুদ্দীন আহমদ (মাসুম) ও রহিমউদ্দীন প্রমুখ।

(১১) **আতফাল বিভাগ** ঃ আতফালদের মোট ষাটটি মজলিসের মধ্যে ৪৭টি মজলিসের বাজেট পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে ঢাকা, কুমিল্লা, বি, বাড়িয়া, ক্রোড়া, ঘাটুরা, চাঁদপুর চা বাগান, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, শালগাঁও, দুর্গারামপুর, বগুড়া, বিষ্ণুপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ মজলিসে নিয়মিত তালিমী ক্লাস চালু আছে। কুমিল্লা, ঢাকা, বি, বাড়িয়া মজলিসগুলো দেয়ালিকা প্রকাশ করেছে। ঢাকা, ঘাটুরা, ক্রোড়া, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর চা বাগান, বি, বাড়িয়া ও নারায়ণগঞ্জ মজলিসগুলোতে আতফাল দিবস পালিত হয়েছে। আতফালুল আহমদীয়াও এবছর হুযূর (আইঃ)-এর বয়াতের তাহরীকে অংশগ্রহণ করেছে এবং বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে।

যাঁরা চির বিদায় নিয়েছেন ঃ

নাম	জামাত	পদবী	তারিখ
মরহুম এস, এম, মোতাহার আলম	ঢাকা	-	৩০-১২-৯২
মরহুম ইয়াসীন নূরী	বীরগঞ্জ	-	২৩-১২-৯২
মরহুম হামিদ হাসান খান	দিনাজপুর	প্রেসিডেন্ট	৯-১-৯৩
মরহুম নাজাতুল্লাহ আহমদ প্রধান	আহমদনগর	মোয়াল্লেম	২১-১-৯৩
মরহুম এরশাদ আলী মিয়া	ঘাটুরা	সেঃ মাল	১৮-১-৯৩
মরহুম তমিজ উদ্দিন আহমদ	ক্ষুদ্রপাড়া	প্রেসিডেন্ট	১৮-১-৯৩
মরহুম কেরামত আলী গাজী	সুন্দরবন	-	১৫-১-৯৩
মরহুমা সুফিয়া আজহার	নারায়ণগঞ্জ	-	২২-২-৯৩
মরহুম আবু তাহের	আহমদনগর	সদর মোয়াল্লেম	৮-৩-৯৩
মরহুম আলী আহমদ	নারায়ণগঞ্জ		২২-২-৯৩
মরহুম আবদুল বারী	ঢাকা	এডিশনাল ন্যাশনাল আমীর	৮-৩-৯৩
মরহুম সৈয়দ শামসুল আলম	চট্টগ্রাম	-	১৭-৪-৯৩
মরহুম আনোয়ার আলী	নারায়ণগঞ্জ	-	৭-৩-৯৩
জনাব গোলাম হোসেনের মরহুমা 'মা'	মুন্সীগঞ্জ	-	২৪-৪-৯৩
মরহুমা সৈয়্যদা পরসা বেগম	ঢাকা	-	১৯-৪-৯৩
মরহুম সুরুজ মিয়া	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	-	২০-৪-৯৩
মরহুম আবদুল হাশিম	"	-	১০-৫-৯৩
মরহুম ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী	ঢাকা	সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ্, বাংলাদেশ	২২-৫-৯৩
মরহুম আসিয়া খাতুন	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	-	২০-৫-৯৩
পুত্র - ডাঃ আবদুল মান্নান সরকার	নারায়ণগঞ্জ	-	১৮-৬-৯৩
মরহুমা হামিদা বেগম	আহমদনগর	-	১৮-৭-৯৩
মরহুম খন্দকার লাল মিয়া	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	-	২৯-৮-৯৩
মরহুম বদর উদ্দীন আহমদ	নারায়ণগঞ্জ	-	১১-৯-৯৩
মরহুমা হায়াতুন্ নেসা বিবি	রেকাবী বাজার	-	২৫-৯-৯৩
মরহুমা মিসেস ডাঃ আবু তাহের	চৌমুহনী	-	৮-৯-৯৩
মরহুম ডাঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরী	ঢাকা	সেক্রেটারী, মজলিসে আমেলা-বাংলাদেশ	২০-১০-৯৩
মরহুম আবদুল হালিম চৌধুরী	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	-	৫-৯-৯৩
মরহুম আবদুল হামিদ	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	-	১৪-১০-৯৩
মরহুমা রুবীনা আক্তার	"	-	৩-১০-৯৩
মরহুমা আবেদা বেগম	বগুড়া	-	১৫-১১-৯৩
মরহুমা সাহেরা বেগম	হোসনাবাদ	-	২৮-১১-৯৩

তালিকায় হয়তো কারো নাম বাদ পড়তে পারে। যাঁরা চলে গেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই সাধ্যমত ইসলামের খেদমত করে গেছেন। দোয়াতে আমরা সবাইকে শামিল রাখবো। তা সত্ত্বেও জামাতে সেবার জন্যে যাঁরা উল্লেখের দাবী রাখেন তাঁরা হলেন সর্বজনাব (১) মরহুম মোহাম্মদ আবদুল বারী, এডিশনাল ন্যাশনাল আমীর, বাংলাদেশ (২) মরহুম ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী, সদর মজলিসে আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ (৩) মরহুম নজরুল ইসলাম চৌধুরী, সেক্রেটারী মজলিসে আমেলা, বাংলাদেশ (৪) মরহুম আবু তাহের, সদর মোয়াল্লেম সিলসিলা আহমদীয়া (৫) মরহুম নাজাতুল্লাহ্ আহমদ প্রধান- মোয়াল্লেম সিলসিলায়ে আহমদীয়া (৬) মরহুম হামিদ হাসান খান, প্রেসিডেন্ট, দিনাজপুর জামাত (৭) মরহুম তমিজ উদ্দিন আহমদ, প্রেসিডেন্ট, ক্ষুদ্রপাড়া জামাত, (৮) মরহুম এরশাদ আলী মিয়া, সেক্রেটারী মাল, ঘাটুরা জামাত।

আমরা তাঁদের সকলের মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁদের পরিবার পরিজনের প্রতিও আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

উপসংহার ঃ

আল্লাহ্তা'লা সূরা আন্ নাস্র-এ এরশাদ করেছেন 'যখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় আসিবে এবং তুমি লোকদিগকে দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করিতে দেখিবে, সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি পুনঃ পুনঃ তওবা গ্রহণকারী।'

যখন লোক দলে দলে ইসলামে দাখেল হবে তখন যারা পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের বিশেষ দায়িত্ব সম্বন্ধে এই সূরাতে বলা হয়েছে - আল্লাহ্র অসীম করুণায় আমাদের দেশেও অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার লক্ষণসমূহ দেখা যাচ্ছে। তাই আমাদেরকে নিজেদের সংশোধন ও মোমেন হিসেবে ক্রমোন্নতির জন্য বেশী বেশী তওবা ও আল্লাহ্র প্রশংসায় ব্যস্ত থাকতে হবে। অর্থাৎ আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যমেই আমরা নবাগত ভাই- বোনদেরকে ভাল মোমেন হবার পথ দেখাতে পারি। আমাদের ভুললে চলবে না যে, যদি আমাদের দোষক্রটি নবাগত ভাই- বোনদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষতির কারণ হয় তবে আমাদেরকে আল্লাহ্র দরবারে জবাবদিহী করতে হবে। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সবার সহায় হউন- যাতে আমরা সবাই মিলে তাঁর ইচ্ছা ও আদর্শকে ব্যক্তি এবং সমষ্টি জীবনে প্রতিফলিত করতে পারি। আমীন। আল্লাহুম্মা আমীন।

মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
ন্যাশনাল আমীর

৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪

সম্পাদকীয়ঃ

বাংলাভাষা ও আহমদী জামাত

বাংলাভাষা বাঙালীর মাতৃভাষা। ভাষা মাত্রই আল্লাহ্র দান। পবিত্র কুরআন বলে, খালাকাল ইনসান আল্লামাহুল বয়ান অর্থাৎ—আল্লাহ্তা'লা মানুষ সৃষ্টি করে তাকে ভাষাজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। প্রত্যেক নবী রসূলই নিজ জাতির ভাষায় ঐশী বাণী লাভ করে প্রচার কার্য চালিয়ে গেছেন। ওমা আরসালনা মির রুসুলিন ইল্লাবিলিসানী কাউমিহী। অতএব সকল ভাষাই ঐশী ভাষা, পবিত্র ভাষা।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এককালে মোল্লা মৌলবীরা বাংলা ভাষাকে হিন্দুয়ানী ভাষা আখ্যা দিয়ে তারা ফার্সী ও উর্দু ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মোল্লা মৌলবীদের (কতিপয় ছাড়া) সমর্থন নিয়ে কেউ কেউ পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা উর্দুর পক্ষে মতামত জ্ঞাপন করলেন। খাজা নাজিম উদ্দীন রাষ্ট্র ভাষা উর্দুর পক্ষে ২৬ জানুয়ারী ১৯৫২ পল্টন ময়দানে বললেন, "উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হবে।" উল্লেখ্য যে, এর আগে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ২১শে মার্চ, ১৯৪৮ তারিখে ঢাকায় এক ভাষণে বলেন,—But let me make it very clear to you that the state Language of Pakistan is going to be Urdu and no other Language. সমগ্র বাংলাদেশ (তখন পূর্ব পাকিস্তান) থেকে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বাঙালী সন্তানেরা অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দিল। বাধ্য হয়ে সরকার উর্দু ও বাংলাকে সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতি দিল (ডন, ৮মে ১৯৫৪)।

কিন্তু আন্দোলন থামল না। ভাষা আন্দোলন থেকে রূপ নিল স্বাধীনতা আন্দোলনের। শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালে সংগ্রামের মাধ্যমে জন্ম নিল স্বাধীন বাংলাদেশ। বাংলাভাষা রাষ্ট্র ভাষার প্রকৃত সম্মান পেল।

বাংলাদেশে আহমদী জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হয় প্রায় ৮০ বৎসর পূর্বে। সেই থেকে আহমদী জামা'ত বাংলা ভাষায় খুতবা দিয়ে আসছে। যদিও গয়ের আহমদী মৌলবীরা বাংলায় খুতবা প্রদান নাজায়েয বলে ফতওয়া দিয়ে আসছিলেন। বাংলাদেশ থেকে যে সব আহমদী প্রচারক বিদেশে ইসলাম প্রচার করতে গেছেন তারা নিজেদেরকে বাঙালীরূপে পরিচয় দিতে গৌরব বোধ করেছেন। যেমন, সুফী মতিউর রহমান বাঙ্গালী (আমেরিকা) খান সাহেব মোবারক আলী (জার্মানী), আবদুর রহমান খান বাঙ্গালী (আমেরিকা) আনিসুর রহমান (ইংল্যাণ্ড), মাহমুদ আহমদ (অষ্ট্রেলীয়া) এঁরা সর্বত্র বাঙালীরূপেই পরিচিত।

১৯৪৭ সালে যখন ভাষা নিয়ে কোন প্রশ্নই উঠে নি তখন আহমদী জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা সরকারকে কতিপয় উপদেশ প্রদান করেন। ঐ সব উপদেশের মধ্যে একটি ছিল ভাষা সংক্রান্ত। তিনি বলেন,—"মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হোক। এ সম্বন্ধে পূর্ব পাকিস্তানের উপর যেন উর্দুকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে চাপিয়ে দেওয়া না হয়। তাহলে কিন্তু এটি পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে যাবে। কেননা ওখানকার অধিবাসীদের বাংলা ভাষার জন্য এক বিশেষ ভালবাসা রয়েছে (দৈনিক আল ফজল, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭)। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঘোষণার চার মাস পূর্বেই এই সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়। কিন্তু সরকার এই সময়োপযোগী সতর্কবাণীকে গ্রাহ্য করল না। ফলে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে

(অবশিষ্টাংশ সূচীপত্রে দেখুন)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর "আইয়ামুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতা'লা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসূল এবং খাতামুল আম্বিয়া। আমরা ঈমান রাখি যে, ফিরিশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরী'অত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামা'তকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলায়হিমুস সালাম) এবং কিতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতা'লা এবং তাঁহার রসূল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্যসমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুযুর্গানের 'ইজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামা'তের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্বেও অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাযেবীনা ওয়াল মুফতারিয়ীনা—"
অর্থাৎ সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী ও মিথ্যারোপকারীদিগের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত।

(আইয়ামুস সুলাহ্ পৃঃ ৮৬-৮৭)

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
দূরালাপনীঃ ৫০১৩৭৯, ৫০২২৯৫

সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
নির্বাহী সম্পাদক ঃ আলহাজ এ, টি, চৌধুরী

Published & Printed by Mohammad F.K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the p oprietors, Ahmadiyya Muslim Jamat, Bangladesh
4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 502295

Editor : Moqbul Ahmad Khan
Executive Editor : Alhaj A. T. Chowdhury